ঝাড়খন্ডের যীশু

শহীদ নির্মল মাহাত



সুনীল মাহাত

ঝাড়খন্ডের যীশু

শহীদ নির্মল মাহাত



সুনীল মাহাত

কিরণ পাবলিকেশন্
জামশেদপুর - ৮৩১০০৩

উৎসর্গ

বাবা- ৺কালীপদ মাহাত

ও

মা- ৺সুভদ্রা মাহাতকে



প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

সবিনয় নিবেদন

নির্মলদাকে নিয়ে ভাল কিছু একটা লেখার ইচ্ছেটা মগজে গজিয়েছিল ওর মৃত্যুর পর থেকেই। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি যে ওকে নিয়ে লিখতে হবে এটা ভাবিনি। ওর মত একটা দুর্লভ চরিত্রের বাস্তব চিত্র অঙ্কনের জন্য যে পরিমান সময়, ফিল্ড ওয়ার্ক, অধ্যয়ন ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন তার কোনটাই আমি পাইনি। এ যেন কোন নীচু জাতের পাখির এলোমেলো বাসা তৈরীর কষ্টকর প্রচেষ্টার মত। নীচু জাতের পাখি এজন্যই বললাম, কারণ বাবুই পাখির মত শিল্পী পাখিরা খুবই তুচ্ছ উপকরণ দিয়েই অদ্ভুত সুন্দর বাসা তৈরি করতে পারে কিন্তু সে ধরণের মুন্সীয়ানার অধিকারী আমি নই। আমার মধ্যে যেটা ছিল সেটা একটা আন্তরিক তাগিদ, নির্মলদার সম্বন্ধে সামান্য কিছু লিখে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত ঘটাব এরকমই একটা ইচ্ছা কাজ করছিল এর মূলে। সে প্রচেষ্টা কতটা সার্থক হয়েছে বুদ্ধিমান পাঠকরা তা বিচার করবেন। বইটি একটি পাণ্ডুলিপি হিসেবে আমি পাঠকদের দরবারে পেশ করলাম। ভুল ত্রুটি শুধরে দিয়ে এবং বইটির উৎকর্ষতা বৃদ্ধির পরামর্শ পেলে পরবর্তী কালে বইটিকে সম্পূর্ণ করতে পারব এই আশা রাখছি।

মানুষের মনের মধ্যে অহরহ অনেক রকম আকাশ কুসুম ইচ্ছাও গজায় কিন্তু তার বাস্তবায়ন ঘটে না প্রায়শই। সেরকমই নির্মলদাকে নিয়ে আমার লেখার ইচ্ছাটা হয়ত আঁতুড়েই বিনষ্ট হতেও পারত কিন্তু ডাক্তার বিদ্যাভূষণ মাহাত সেটাকে বিনষ্ট হতে দিলেন না, সেটাকে বাঁচিয়ে তোলাটা একজন ডাক্তার হিসেবে কর্তব্য বলে মনে করলেন। বলতে গেলে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই বইটি তৈরি হল। এমনিতে নিজে থেকে লিখতে গেলেও তাঁর সাহায্য আমাকে নিতেই হোত। তিনি বলে গেলেন, আমি লিখে গেলাম, ঘটনাটা অনেকটা এইরকম। অবশ্যই আমি আমার ব্যর্থতাও ওঁর ঘাড়ে চাপাতে চাইছিনা। ভয় হচ্ছে ওঁর পরিকল্পনাটাকে আমি কতখানি রূপ দিতে পারলাম এই ভাবনা ভেবে। বইটি প্রকাশের জন্য আর্থিক দায়িত্বও নিলেন তিনিই,

নইলে কোনদিনই হয়তো বইটি বই আকারে বেরুত না। বিভিন্ন কারণে সময়মত ছাপানোও গেল না।

আর যাদের সহযোগিতার কথা না বললেই নয় তাঁরা হলেন শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী বীনাপানি মাহাত, সৌরভ মাহাত, প্রফুল্ল কুমার মাহাত, সুনীল মাহাত, শ্রীকান্ত মাহাত, সুসেন মাহাত, পশুপতি প্রসাদ মাহাত, শ্রীমতী বাসন্তী মাহাত, সৃষ্টিধর মাহাত, সীতারাম শাস্ত্রী, কেদার মাহাত, চিন্ময় মাহাত, অশোক মাহাত, বিভূতি ভূষণ মাহাত, সুশীল, সুশান্ত, সত্য, রাজেশ, চন্দ্রা ও বিউটি মাহাত।

বইটি রচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত গ্রন্থ বা প্রবন্ধের সহায়তা নিয়েছি, সেগুলি হল যথাক্রমে পশুপতি প্রসাদ মাহাতর, আদিবাসী অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবস্থা, পাইকিরায় মুন্ডার, বিদ্রোহীকা ভূমি ঝাড়খন্ড, দীনেশ্বর প্রসাদ সিংহের-অমরশহীদ নির্মল মাহাতো এবং সীতারাম শাস্ত্রীর, 'নির্মল মাহাতো এর আদর্শ থে'। এছাড়াও বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সহায়তা নিয়েছি। সারদা প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং ওয়ার্কসের কর্মীরা আন্তরিকতার সঙ্গে অত্যন্ত কর্মব্যস্তার মধ্যেও যত্ন সহকারে বইটি ছেপেছেন এজন্য তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

বইটি পড়ে নির্মলদার বিরাট ব্যক্তিত্ব অননুকরণীয় চরিত্র, আত্মত্যাগ এবং বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্বন্ধে পাঠকের কিছুমাত্র ধারণা জন্মালে আমি আমার পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব।

সুনীল মাহাত

তাং- ৮/৮/৮৮

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ঝাড়খন্ডের যীশু, শহীদ নির্মল মাহাত, যখন প্রকাশিত হয়, তখন বইটির গুরুত্ব ততখানি বোঝা যায়নি। কিন্তু যত দিন যায় বইটির চাহিদা বাড়তে থাকে। বিদ্বজন দ্বারা বইটি প্রশংসিতও হয়। অনেকেই পুণর্মুদ্রণের অনুরোধ করেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে ছাপানোর ব্যাপারে দেরি হয়। অবশেষে কোন রকম সংযোজন বিয়োজন ছাড়াই বইটি প্রকাশিত হোল। প্রায় ৩৪ বছর পরে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে নির্মলদার কর্মকান্ড নিয়ে রচিত 'ঝাড়খন্ডের যীশু' আশা করি বর্তমান প্রজন্মের পাঠকদের ভালো লাগবে।

সুনীল মাহাত

তাং- ৮/১/২০২৩

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা
'ঝাড়খনডেক যীশু', পঁথি ছাপানিক বানারেঁ

মঞ রাধানাথ মাহাত, বাপ সিতারাম মাহাত, মাঞ সুগা মাহাত, গাঁও-নুনিআ, ডাক-কদমপুর, থানা-আড়সা, জিলা-পুরলিআ, পছিমবাঙলা। চাসা ডিঁড়াঞ মর জনম। মাঞভাখি কুড়মালি, জনমবেরি ২৪-০৮-১৯৬৪। বেগুনকুদর - ইসকুলেক পঢ়ুআ। রামানন্দ কলেজ বিসনুপুরলে বিএসসি (অনারস, বোটানি) ফেইর উততর বঙগ ইনভারসিটিলে এম এস সি পাস। ১৯৯২-২০০৫ তক বারি - ইসকুলে মাসটারিক নকরি। ফেইর ২০০৫ লে এখুনতক গাড়াফুসড়া - (উ: মা:) ইসকুলেঁ হেডমাসটারিক নকরি। ছুটুলেই পরকিতিক উপরেঁ টান। কলি, কেহনি, টুসু, করম, বাঁদনা গিত, কুড়মালি ছিতরন (উপন্যাস) হেনতেন চিসেক বেজাঞ সখিআনি।

চলেইতে বুলেইতে পুরলিআ মটর ঠেকানে ছুটুমুটু চা-পকড়িক দকানেঁ পেহিল গালসাল। মঞ উখনে এম এস সি পঢ়ুআ। জানাপ-চিনহাপ হেলেইক কবি, সাহিতকার, ঝুমরিআর, সুনীল মাহাতক সঁগে। বি এস সি পাস কেরেক বাঁদে, এল এল বি ফেইর কুড়মালিঞ এম এ পাস কেরিকেও গটে জিনাগানি সাহিতকর রসে ডুবি রহা অনাটা মাটিক মানুস। ডহনডালি (ছিতরন), টেসারাজাক পাঁখা (কলিহালা), পিঁদাড়ে পলাশের বন (ঝুমুর), কুড়মালি রামকাথা, মাহাভারত কাথা, হেনতেন চিসিখুন সাহিত জগতেঁ লওতন দিসা দেখাওলেইন। ঝুমেইর গিতে হালি ভাভনা, আধুনিকতা এখরাকেরে সিরজন। এখন কুড়মি বওড়েক তালেবর। সাহিতেক খদিনদিএ পেসা। মকেও চিসেলাই হিঁসকাওলা। এখরাকেরে চিসল, 'ঝাড়খন্ডের যীশু, সহীদ নির্মল মাহাত' পঁথিটা, সমাজেক সুখ দুখেক কাথা কহেক, সমাজ পরিবরতনেক কাথা কহেক দলিল। এহে পঁথিটা ঘুরিকে ছাপাওএক আড়াপাটা লেলাহাত। জানিকে মঞ ছাপানিক কামে সাঁহাই কেরেক ভাগিদারি হেলিঅ অখর চিসন জুগেঁ জুগেঁ বাঁচি রহওক এহেটোই হামর মনের আসরা ফেইর সাহিতেক পিআস......।



নেহরে
রাধানাথ মাহাত
হেডমাসটার, গাড়াফুসড় - (উ: মা:) স্কুল,
মেমবার, পঃ বঃ কুড়মি ডেভঃ এনড কালচারাল বওড়

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :-

১) কুড়মালি মাহাভারত কাথা (মহাকাব্য)
২) কুড়মালি রামকাথা (মহাকাব্য)
৩) রবি ঠাকুরেক গিত (রবীন্দ্র সঙ্গীতের কুড়মালি অনুবাদ)
৪) সাতুল (কুড়মালি গল্প সংকলন)
৫) ডহনডালি (কুড়মালি উপন্যাস)
৬) কুড়মালি করম কাথা (কাব্য)
৭) টেসারাজাক পাঁখা (কুড়মালি কাব্যগ্রন্থ)
৮) পিঁদাড়ে পলাশের বন (ঝুমুর গীত)
৯) সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত সুনীল মাহাতর ছোটদের গল্প (সংগ্রহ ও সম্পাদনা - স্বরূপ দত্ত)
১০) ঝুমুর কথা (সম্পাদিত)
১১) জল ও রক্ত (নাটক, যন্ত্রস্থ)
১২) একলব্য অনেক (নাটক, যন্ত্রস্থ)
১৩) উদা-ভুড়রাক কেহনি (কুড়মালি নাটক, যন্ত্রস্থ)
১৪) জিঅন কেহনি (কুড়মালি জীবনীগ্রন্থ, যন্ত্রস্থ)
১৫) নাচনী প্রথা ও নৃত্যশিল্প (যন্ত্রস্থ)

উলিয়ান একটি গ্রাম

রাঁচির নগরা গ্রাম থেকে, পাহাড়ের কোল বেয়ে, শাল, মহুল, পিয়ালের জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে, মানভূম, পাতকুম হয়ে, সোনারী, কদমা উলিয়ানের উপর দিয়ে মানগোকে বাঁয়ে রেখে, ঝাড়গ্রাম বালেশ্বর হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে সুবর্ণরেখা নদী। অন্যদিকে ময়ূরভঞ্জের রায়রঁগপুর থেকে সিংভূম এর উপর দিয়ে আসতে আসতে সোনারীতে এসে খড়কাই মিশেছে সুবর্ণরেখায়।

সোনারীর এই দোমহনীর একদিকে ধলভূম, ডবঅ-সাঁপড়ার দিকে সেরাইকেলা, মানভূম। দোমহনীর এপাশে সোনারী, উলিয়ান ওপাশে বুনো হাতির পালের মত দলমা পাহাড়ের সারি, ক্রমশঃ উঁচু হতে হতে নীল থেকে ঘন নীল হয়ে মিশে গেছে নীল আকাশের গায়ে। পাহাড়ের গায়ে, ঢালু পাদদেশে শাল-মহুলের ঘন জঙ্গল, কালো ছেলের মাথার কুঞ্চিত কেশদামের মতোই ঘন সুন্দর।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ, ভারতবর্ষে তখন ব্রিটিশ শাসন। টাটা কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়াররা স্টীলপ্ল্যান্ট স্থাপন করার জন্য সার্ভে করতে এসে দেখলেন, দলমা অযোধ্যা রেঞ্জের চিটাবুরু, গজাবুরু, ঢেলবুরু বড়পাহাড়ের সারি, বাদামপাহাড় চাইবাসা কোলহানের নাম না জানা ছোটবড়, পাহাড় টিলা, ডুংরি, নীলপদ্মের পাঁপড়ির মত সযত্নে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ছোটনাগপুর মালভূমির উঁচু নীচু কাঁকুরে একটুকরো ভূমি।

পাহাড়ের কোলঘেঁসে প্রায় তিনদিক ঘিরে পরিখার মত বইছে খড়কাই আর সুবর্ণরেখার গেরুয়া আর নীল জল কল্ কল্ শব্দে। উত্তরে দলমা পাহাড়ের এপাশে নিমডি, চান্ডিল রঘুনাথপুর, পটমদা, গোবরঘুসি, বামনি, ধূসরা, অন্যদিকে বাঘবেড়া জুগসেলাই, কালিমাটি, ঘাটসিলা, সিমলাপাল। একদিকে ধানচাটানি, খাড়েং গাজাড়, ঘড়াবাঁধার বস্তি অন্যদিকে গামারিআ দিন্দলি সোনারী, কদমা, উলিয়ানের ওপাশে খড়খাই এর গেরুয়া জলের ঢেউ।

নীলপদ্মের পাঁপড়ির মত পাহাড় দিয়ে ঘিরে রাখা ভূমিতে শাল-পিয়ালের, অর্জুন-শিমূলের, মহুল-পলাশের জঙ্গলের মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। মহুলবেড়া, কালিমাটি, কাশিডি, ধাধকিডি, কদমা জুগসেলাই, সোনারী, খুঁটাডি, বেলডি, বিষ্টুপুর, সাঁকচি, সিধগোড়া, বারিডি, মুড়াকাটি, মোহরদা, সুসনী গাড়িয়া, খাড়েংগাজাড়, টেটেঙ্গাবস্তি, বাঘাকুদর, গোলমুরি, ঘড়াবাঁধা, বাট্যা, গমরিগাড়া, নীলডি, বালিচালা,

বাড়া, জজবেড়া, উলিয়ান ইত্যাদি।

ছোটনাগপুর মালভূমির অন্যান্য গ্রামাঞ্চলের মতই উলিয়ান, কদমা, সোনারী, বেলডি, ধাধকিডি, জুগসেলাই, খুঁটাড়ি, খাড়েংগাজাড়, ঘড়াবাঁধা, সুসনিগাড়িয়া, বাঘাকুদরে বাস করত কুড়মি-মাহাতরা, সাঁকচিতে গোঁড়রা, বিষ্টুপুরে কুমাররা, সিধগোড়া বারিডিতে ভূমিজ সাঁওতালরা, টেটেঙ্গাবস্তিতে হো'রা পাশাপাশি আপনজনের মত কেঁওটরা ও অন্যান্যরা।

ছোটনাগপুর-সাঁওতাল পরগণার অন্যান্য অঞ্চল থেকে টাটা কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়াররা যেমন করে আলাদা করে বেছে নিল এই জায়গাটা স্টীলপ্ল্যান্ট গড়ার জন্যে, তেমনি করে বিষ্টুপুর সাঁকচি মহুলবেড়া জজবেড়া থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়ে গেল একটি গ্রাম 'উলিয়ান'।

কে যেন বলছিল সাঁওতালদের সিধু-কানু চাঁদ-ভৈরব, তিলকা মাঝির হুল, ধানী মুণ্ডার, সুগনা মুণ্ডার ছেলে বিরসা মুণ্ডার, মুণ্ডাদের বিরসা ভগবানের 'উলগুলান' মিলেমিশে নামটা হয়েছিল 'হুলিয়ান'। পরে সেটা 'উলিয়ান' হয়ে গেছে। কে যেন বলছিল উলিয়ান এসেছে কুড়মালি অরিয়ান অর্থে পরিষ্কার করা থেকে। যাই হোক নামটা এখন উলিয়ান-উলিয়ান!

পঁচিশে ডিসেম্বর

প্রতি বছরই ফিরে ফিরে আসে পঁচিশে ডিসেম্বর। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের কাছে অতি পবিত্র দিন। ঐদিনই প্যালেস্টাইনের বেথেলহেমে রোমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যীশুখ্রীষ্ট। দরীদ্র মেষপালক যোশেফ এর ছেলে হয়ে মাতা মেরীর কোলে এসেছিলেন যীশু। দরীদ্র অসহায় মানুষদের বুকে টেনে নিয়েছিলেন তিনি। তাদের কানে দিয়েছিলেন ভালবাসার মন্ত্র, একত্রিত হওয়ার মন্ত্র, বাঁচার মন্ত্র। শাসকবর্গ তার বিরুদ্ধে এনেছিলেন রাজদ্রোহের অভিযোগ— দিয়েছিলেন অসহায় দরিদ্র মানুষের কল্যাণের জন্য। তাই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন। তাঁর আত্মত্যাগের কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরদিন। যতদিন বেঁচে থাকবে মানবসভ্যতা, মানুষ জাতি। ২৫শে ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিন চিহ্নিত হয়ে থাকবে, পবিত্রতম দিন হিসেবে।

যীশুর আগে এবং যীশুর পরে ঐ পঁচিশে ডিসেম্বরে এই পৃথিবীতে এপর্যন্ত জন্ম নিয়েছে কোটি কোটি শিশু ভবিষ্যতেও জন্মাবে কয়েক হাজার কোটি, কিন্তু জন্মায়নি আর একটি যীশু, যীশুর আগে বা পরে। ভবিষ্যতে জন্মাবে কিনা বলে দেবে ভবিষ্যৎ। কিন্তু ঐ ২৫শে ডিসেম্বরে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে জামসেদপুরের উলিয়ান বস্তিতে জগবন্ধু মাহাতর ছেলে হয়ে প্রিয়া মাহাতর কোলে জন্মগ্রহণ করলেন নির্মল, নির্মল মাহাত, ঝাড়খণ্ডের যীশু।

সুবর্ণরেখা আর খড়কাই এর জলে আবির ছড়িয়ে, দলমা পাহাড়ের শাল মহুলের জঙ্গলের কচি শালপাতার গায়ে সোনালী সোহাগ বুলিয়ে সূর্য যখন পাহাড়ের কোলে

মুখ লুকোল, প্রিয়া মাহাতর কোলে এলো নির্মল, নির্মল মাহাত, কোল আলো করে প্রিয়া মাহাতর।

দিন নয় রাত নয় গোধুলী। সন্ধ্যা তখনও নামেনি, সুবর্ণরেখা-খড়কাই এর জলে দলমা পাহাড়ের কোলে, শাল-মহুলের জঙ্গলে, জংলী ফুলের ওপর তখনও সূর্যের শেষ আলোর ছোঁয়া, নির্মল জন্মগ্রহণ করলেন উলিয়ান বস্তিতে। টাটা কোম্পানীর জমিদারীর আওতায় উলিয়ান বস্তি। বিষ্টুপুর, সাঁকচি, কদমা, ধাধকিডি, বেলডিতে সে সময় আর কোন শিশু ভুমিষ্ট হয়েছিল কিনা, কোন কোল কুড়মি, কুমহার, সাঁওতাল, ভূমিজ গোঁড়দের বাড়ীতে সেই সময় গোটা সাঁওতাল-পরগণা, ছোটনাগপুরের মালভূমি, ঝাড়খন্ড জঙ্গলমহলে আর কোন মায়ের কোল আলো করে আর কোন শিশু জন্মেছিল কিনা তা যেমন আমাদের জানা নেই, উলিয়ানের জগবন্ধু মাহাতর ছেলে হয়ে নির্মল মাহাতর জন্মগ্রহণও তেমনি নিঃশব্দেই হয়েছিল। যীশুরা, নির্মলরা জন্ম নেয় নিঃশব্দে কিন্তু চলে যায় পৃথিবী কাঁপিয়ে পৃথিবীর নরম মাটিতে, কঠিন পাথরে পদচিহ্ন রেখে।

জন্ম মুহূর্তে আর পাঁচটা শিশু যেমন করে কাঁদে, নির্মলও তেমনি কেঁদেছিল। কিন্তু সেই কান্নার মধ্যেও যে আলাদা কিছু লুকিয়েছিল, সেদিন জগবন্ধু মাহাত, প্রিয়া মাহাত বা উলিয়ানের মানুষজন তা বুঝতে পারেনি। নির্মল জন্মালেন জগবন্ধু মাহাতর দ্বিতীয় পুত্র হয়ে প্রিয়া মাহাতর বড়ছেলে, বিমলের ভাই হয়ে, মেয়ে শান্তির ভাই হয়ে। আগে ছিল দাদা বিমল, এবার এল ছোটভাই নির্মল, শান্তির খেলার পুতুলের মত। বড় আনন্দ ছোট মেয়ে শান্তির। বড় ভাই নয় ছোট ভাই খেলার সাথী, খেলাঘরের পুতুলের মত। যে তার কথায় উঠবে বসবে নড়বে-চড়বে, হাসবে কাঁদবে। যার উপর খবরদারী করতে পারবে শান্তি। ছোট্ট মেয়ে শান্তি ছোট্ট পুতুলের মত নির্মলের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেকি সেদিন তেমন কিছু ভাবতে পেরেছিল? পারেনি, বাবা জগবন্ধু আর মা প্রিয়া মাহাত কিংবা উলিয়ান বস্তির পাড়াপড়শীদের কেউই।

মহাপুরুষের আবির্ভাবের আগে তেমন কিছু ভবিষ্যদবানী সেদিন হয়নি। জামশেদপুরের বস্তিবাসীর কাছে আর পাঁচটা বিবর্ণ দিনের মতই সেদিনটাও বিবর্ণ ছিল, নতুন কিছুর আর্বিভাবের বার্তা সেদিন ঘোষিত হয়নি আগেভাগে। খ্রীষ্টানদের বাড়িতে সেদিন ছিল উৎসবের আনন্দ। ঈশ্বরের পুত্র যীশুর আবির্ভাবের দিন ছিল সেটা। কিন্তু কুড়মি কুমহার, সাঁওতাল, ভূমিজ, হো, গোঁড় কেঁওটদের বস্তি ছিল নিস্তরঙ্গ সাদামাটা।

নির্মলের সংসার

জগবন্ধু মাহাতোর বাড়িতে প্রিয়া মাহাতর বুকের দুধ পান করে পাড়া-পড়শীদের কোলেপিঠে, উইলিয়ানের বস্তিতে বেড়ে উঠেছিল নির্মল, নির্মল মাহাত, ঝাড়খন্ডের

যীশু। দলমা, শিমলি পাল, কিরিবুরু, বাদাম পাহাড়, অযোধ্যা পাহাড়, রাজমহল, হাজারীবাগের জঙ্গলে বাঘের বাচ্চা যেমন করে বাড়ে, শালবীজ থেকে ঝোপ জঙ্গলের উপরে মাথা উঁচু করে শালপংড়া যেমন করে বাড়ে। কিন্তু কেউ কি জানত এই শাল পংড়া জঙ্গলের লক্ষ লক্ষ শালগাছের উপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে! সিংভূম, বরাভূম, পাতকুম মানভূম, শিখরভূম, ছাড়িয়ে রাঁচী, হাজারিবাগ পালামৌ, রাজমহল ছাড়িয়ে গোটা ঝাড়খন্ডের, কোল, কুড়মি, মুন্ডা, সাঁওতাল, ওঁরাও, হো, খাড়িয়া, বীরহোড়, রাজোয়াড়, ঘাসি, ডোম, কুইরী, কুমহার সেই শালগাছকে জাহের এরার মত, সিংবোঙার মত, মারাংবুরু বড় পাহাড়ের মত পুজো করবে এটাই বা কে জানত।

ফুটফুটে শিশু নির্মল বাপ মায়ের কাছে বড় আদরের, আদরের ছিল পাড়া পড়শীদের কাছেও। কিন্তু বাপ মায়ের স্নেহের ভাগ বসাতে নির্মলের পরে জন্ম নিল আরও ছ'ছটা ভাই। সুশীল, সুধীর, প্রদীপ, অশোক, অসীম, অসিত। বাপ-মায়ের কাছে সব ছেলেই সমান, তবু নির্মল যেন আলাদা ধাতুতে গড়া। ওর টানই আলাদা।

বোন শান্তিকে নিয়ে নির্মলরা নজন। জগবন্ধু বাবু চাকরি করেন টাটা কোম্পানীর কারখানায়। কিন্তু একজনের আয়ে এতবড় সংসারটা চালাতে গিয়ে হিমশিম খান তিনি। অভাবের সংসার জোড়াতালি দিয়ে কোন রকমে চলতে থাকে। শুভাকাঙ্খীরা সমবেদনা জানায়। কিন্তু নির্মল কারও অনুকম্পার পাত্র হয়ে থাকবে একি হতে পারে। বাবা মায়ের সঙ্গে ভাইদের মানুষ করার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে নির্মল, মায়ের অবর্তমানে রান্না করে, ভাইদের স্নান করায়, খাওয়ায় স্কুলে পাঠায়। কোন কারণে মা বাড়ির বাইরে গেলে ভাইএরা বুঝতেই পারে না মায়ের অভাব। মা বাড়ীতে থাকলেও মাকে সাহায্য করে নির্মল।

বড় পরিবারের বিরুদ্ধে আধুনিক ব্যাখ্যা মানতে রাজি নয় ও। পুরনো দিনের কথা বলে নির্মল। যখন ছিল অধিক জনসংখ্যা অর্থে অধিক সম্পদ। কুড়মিদের সামাজিক অনুষ্ঠানের কথা বলে নির্মল। কুড়মিরা এখনও বিয়ের আগে, ছেলের বিয়ে দেয় আমগাছের সঙ্গে, মেয়ের বিয়ে দেয় মহুল গাছের সঙ্গে। এর অর্থ পুরুষ হবে আমের মত মিষ্ট এবং মেয়ে হবে মহুলের মত অজস্র ফলদায়িনী। অধিক সন্তান অর্থে অধিক শ্রম এবং অধিক সম্পদ, স্বাচ্ছন্দ। কৃষিজীবি শ্রমজীবি মানুষদের এই থিয়োরি এখন অচল। তার কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ একথা মানতে পারে না নির্মল। মানুষের দারিদ্রের মূল কারণ বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থা এবং অসম বন্টন। নির্মল ভাবে এর জবাব তাকে দিতে হবে। জনসংখ্যা কোনক্রমেই পৃথিবীর বোঝা হতে পারেনা যদি তাকে ঠিকমত কাজে লাগানো যায়। তাই সে মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করে—মনের ভেতরে একটা ইচ্ছে দানা বাঁধতে থাকে। লেখাপড়া শিখে চাকরি করবে ও । মা বাবার সঙ্গে ভাইদের মানুষ করার দায়িত্ব নেবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ বিদ্যালয়, টাটা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন হাইস্কুল, সেখান থেকে জামশেদপুর কো-অপারেটিভ কলেজ। পড়াশুনায় অত্যন্ত মনোযোগী ছাত্র

নির্মল। মনের মধ্যে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চিন্তা, সংসারের চিন্তা, ভাইদের মানুষ করার চিন্তা। ছোট্ট নির্মল দেখতে দেখতে কখন যে বাবা মাকে ছাড়িয়ে গোটা পরিবারটার অভিভাবক হয়ে গেছে সে নিজেই বুঝতে পারেনি। গোটা সংসারটাকে, এতবড় পরিবারটাকে যেন বুক দিয়ে আগলে রাখতে চায় নির্মল। কিন্তু কেউ কি জানত গোটা ঝাড়খন্ডের প্রতিটি কোল, কুড়মি, কোড়া, মুন্ডা, সাঁওতাল, খেড়িয়া, কুমহার, কুমার, তাঁতি, জোলা, রাজোয়াড়, ঘাটোয়াল, ডোম-ঘাসিদের পরিবারকে নিজের সংসার বলে মনে করবে ও। নিজের জন্য নয় নিজের পরিবারের জন্য নয় ঝাড়খন্ডের প্রতিটি কৃষিজীবি, শ্রমজীবি, বৃত্তিজীবি, বনবাসী পরিবারের ভালোমন্দর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করবে।

আসলে নিজের পরিবারটাকে, বাবা-মা, ভাই বোনকে বুক দিয়ে ভালবাসতে গিয়ে সমগ্র ঝাড়খন্ডের, সমগ্র ভারতবর্ষের তথা সমগ্র বিশ্বের শ্রমজীবি, মেহনতী কৃষিজীবি, বনবাসী, শোষিত, বঞ্চিত নিপীড়িত, নির্যাতীত মানবদের ভালবেসে ফেলেছিল নির্মল। যেমন করে নগরা-গ্রামের পাহাড়ী ঝর্ণা সুবর্ণরেখা হয়ে সমুদ্রে মিশে যায়, যেমন করে মানস সরোবর থেকে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গা, গঙ্গা হয়ে সমুদ্রে নামে, যেমন করে পায়ে চলা পথ মিশে যায় রাজপথে, নির্মলের নিজের পরিবারের নিজের সংসারের প্রতি ভালবাসা উইলিয়ান ছাড়িয়ে, সিংভূম ছাড়িয়ে গোটা ঝাড়খন্ডকে প্লাবিত করে উন্নীত হোল বিশ্বপ্রেমে। যে প্রেমের প্রেমিক হয়ে যীশু প্রাণ দিয়েছিলেন ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে, মাথায় কাঁটার মুকুটের যন্ত্রণা সয়েছিলেন হাসতে হাসতে, যে প্রেমের প্রেমিক হয়ে সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ হয়েছিলেন সিধু-কানু, বিরসা মুন্ডারা, প্রাণ দিয়েছিলেন ব্রিটিশের হাতে, সেই প্রেমের প্রেমিক হলেন নির্মল, নির্মল মাহাত, ঝাড়খন্ডের যীশু।

দোমহনীর মায়া

এই সেই দোমহনী। কখনও উলিয়ানের বস্তি ছাড়িয়ে, কখনও বা সোনারীর ওপাশ দিয়ে টাটা কোম্পানীর রাস্তার ভাঙা ভাঙা পিচ মাড়িয়ে, শালবনের ফাঁকে ফাঁকে হেঁটে যায় নির্মল। খড়কাই এর কোলে কোলে, খলসে যাওয়া তীরে হাঁটতে হাঁটতে, কখনও বা খড়কাই এর গেরুয়া জল মিশে গেছে সুবর্ণরেখার নীল জলে।

সুবর্ণরেখার নীল জল আর খড়কাই এর গেরুয়া ঘোলাটে জলের স্রোত অনেকদুর পর্যন্ত মানগোর দিকে দলমা পাহাড়ের কোল ঘেঁসে পাশাপাশি বয়ে যায়। নীল আর ঘোলাটে জলের মাঝখানে কে যেন একটা রেখা টেনে দেয়। কখনও বা শালগাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসে কখনও বা নদীতীরে পাথরের চাটানে বসে নদীর জলে পা ডুবিয়ে, চুপচাপ চেয়ে থাকে নির্মল। দলমা পাহাড়ের গোড়ায়, গায়ে মাথায়, সবুজ ঘন জঙ্গল, আদিবাসী ছেলের মাথার কোঁকড়ানো কালো চুলের মত সুন্দর। দলমা ক্রমশঃ উঁচু হতে হতে ফ্যাকাশে নীল রঙ ধরতে ধরতে গাঢ় নীল হয়ে মিশে

গেছে আকাশের গায়ে। পেঁজা তুলোর মত মেঘেরা পাহাড়ের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ওড়ে। বর্ষাকালে হঠাৎ তাকালে মনে হয় মেঘ করেছে আকাশ জুড়ে। ঘন কালো মেঘ। নদী এখানে ত্রিধারা। সুবর্ণরেখা আর খড়কাই দুদিক থেকে কোনাকুনি ছুটে এসে মিলিত হয়েছে দোমহনীতে এবং বয়ে গেছে দলমার কোল ঘেঁসে যেন দুটো বিশালাকার পাহাড়ী অজগর বেরিয়ে এসেছে বুনোহাতির পালের মতো পাহাড়ের আড়াল থেকে। একদিকে দলমার সবুজ সৌন্দর্য, অন্যদিকে জামসেদপুরের চিমনির ধোঁয়া। টেলকো, টিসকো, কেব্‌ল, জেমপোর কংক্রীটের কঠিন কঠোর শহর জামশেদপুর।

শহর ভালো লাগেনা নির্মলের। ছুটে যায় গ্রামের দিকে। সোনারী, কদমা, উলিয়ানকে এখন আর পুরোপুরি গ্রাম বলা যায় না। শহর ক্রমশঃ ছুটে আসছে এদিকে গ্রামকে লুটতে। চিমনির বিষাক্ত ধোঁয়া ছুটে আসছে গ্রামের দিকে অহরহ। নির্মল তাই গ্রাম চায়। খড়কাই আর সুবর্ণরেখা উলিয়ানকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে গ্রাম থেকে। তবু খড়কাই এর তীরে দোমহনীর কাছে হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের গন্ধ পায় নির্মল। শালগাছের গায়ে হেলান দিয়ে ছায়ায় বসে নদীর ওপারের গ্রামগুলির দিকে চেয়ে থাকে নির্মল। চেয়ে থাকে দোমহনীর জলের উপর, দলমার জঙ্গলের দিকে। দোমহনী তাকে টানে, তাই সময় পেলেই ছুটে যায়। দোমহনীর জলের কলধ্বনীতে শুনতে পায় সুবর্ণরেখা আর খড়কাই এর মিলনের গান কল্‌কল্‌ কথা অবিরাম।

নির্মল যেভাবে দেখে দোমহনীকে ১৮৯০ সালে টাটা কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়াররা স্টীল প্লান্টের নক্সা করতে এসে তেমন ভাবে দেখেনি, দেখেছিল অন্যভাবে। বাদাম পাহাড়ের আয়রণ ওর থেকে তৈরী হবে স্টীল। তাই ওরা প্রথমে বাদাম পাহাড়েই স্টীল প্ল্যান্ট গড়ার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু ওখানে নেই সুবর্ণরেখা আর খড়কাই এর দোমহনী। তাই সেই পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়। ১৯০৩ সালে সার্ভে করা হয় স্টীল প্ল্যান্টের। পরিকল্পনাটা এই রকম। বাদাম পাহাড়, নোয়ামুণ্ডি থেকে নেওয়া হবে আয়রণ ওর, সুবর্ণরেখা আর খড়কাই এর জল, ডিমনা লেকের পানীয় জল, ঝরিয়া ধানবাদের কয়লা।

স্টীল প্ল্যান্টের পরিকল্পনা করেই মারা গেলেন জামশেদজী টাটা। জামশেদজীর ছেলে রতনজী টাটা পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করলেন। ১৯০৭ সালে টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল প্ল্যান্ট এর চিমনি থেকে প্রথম ধোঁয়া বেরুতে শুরু করে। জামশেদজী নসরতজী টাটা থেকে রতনজী টাটা এবং কোম্পানীর পরিকল্পনাকারী ইঞ্জিনীয়াররা সবাই জানত টাটা কোম্পানীর চিমনির এই ধোঁয়া একদিন মানগো থেকে খাড়েংগাজাড়, ধানচাটানি কালিমাটি থেকে সোনারী কদমা উলিয়ানকে গ্রাস করে নেবে। কিন্তু বিস্টুপুর, সাঁকচি, ধাধকিডি, বাঘাকুদর, টেটেঙ্গাবস্তি, জজবেড়া, মহুলবেড়ার কুড়মি, কুমহার, গোঁড়, হোরা, সাঁওতাল, ভূমিজরা তা ভাবতে পারেনি। তারা শুধু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল আকাশের দিকে মুখকরা চিমনির দিকে, চিমনি থেকে হু হু করে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার দিকে, ধোঁয়ার মেঘের দিকে। যে মেঘ

থেকে ঝরেনা প্রানদায়ী বৃষ্টির ফোঁটা, ঝরে বৃষ্টিহীনতার বিষবাষ্প। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের দুঃস্বপ্ন তাদের মন থেকে তখনও মুছে যায়নি। প্রকৃতির রোষে দলমার জঙ্গল পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। পরপর তিনচার বছরের অনাবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষেতে ধুলো উড়ছিল। কারো কুঠরিতে ছিল না এককনা চাল। পেটের জালায় লোকে গাছের পাতা, শেকড়, অখাদ্য কুখাদ্য খাচ্ছিল। কলেরা মহামারিতে গাঁকে গাঁ উজাড় করে পিঁপড়ের মত মরছিল মানুষ। দিনে রাতে আকাশের দিকে মুখ উচু করে কুকুরের ডাক,- হুঁ- হুঁ করে অলক্ষুনে ডাক। বাড়ীর উঠোনের গাছে বসে থাকে শকুন। টাটা কোম্পানীর কারখানা থেকে সকাল বিকেল হু হু করে সাইরেন বাজে। গ্রামবাসীদের মনে পড়ে যায় মন্বন্তরের কুকুরের অলক্ষুনে হু-হু করে আকাশ মুখো ডাক। বুকের রক্ত ভয়ে হিম হয়ে যায় তাদের। মন্বন্তর কি আবার ফিরে এল।

জনপদ কথা

গোটা সাঁকচি জুড়ে ছিল বিশাল আমবাগান। গোঁড়রা বাস করত সেখানে। বিষ্টুকুমারের নামে কুমহারদের বস্তীর নামকরণ হয়েছিল বিষ্টুপুর। সিধগোড়া বারিডিতে থাকত ভূমিজ, সাঁওতালরা। উলিয়ান কদমা, সোনারী বেলডী, ধাধকিডি, জুগসেলাই, খুঁটাডি, মুসনিগাড়িয়া, খাড়েংগাজাড়, বাঘাকুদর, গোলমুরিতে কুড়মি-মাহাতরা, টেটেঙ্গাবস্তিতে হোরা। ব্যাটা, গমরিগাড়া, ভাটিয়াবস্তি, নিলডি বালিচালা, বাড়া, জজবেড়া, কাশিডি, কদমা মহুলবেড়া সব মিলিয়ে জনসংখ্যার শতকরা ৬৫ ভাগ ছিল কুড়মি-মাহাত, ১৫ শতাংশ কুমহার, গোঁড়, ভূমিজ ২৫ শতাংশ কেঁওট ৫ শতাংশ।

নীলপদ্মের পাঁপড়ির মত পাহাড় দিয়ে ঘেরা একখণ্ডভূমি। ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত। সমতল নয় বন্ধুর উঁচু-নীচু সমুদ্রের ঢেউএর মত। নীচু জমিকে ছোট ছোট ভাগ করে সমতল করে উঁচু আল দিয়ে ওরা তৈরী করেছে ধানের ক্ষেত। পাহাড়ের গায়ের জঙ্গলের পচা লতা-পাতা থেকে, ধুয়ে আসা মাটি থেকে প্রাকৃতিক সার জমা হয় ধানের জমিতে। রোয়াধান লক্‌লক্ করে বাড়ে। উচু জমিতে মাঠে হয় কলাই, মুগ, রাহেড়, রমহা, গুদলি, কদঅ। গড়ানো জমির মাঝখানে আল দিয়ে ওরা তৈরী করেছে পুকুর। বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য। ধরন হলে চাষের জমিতে সেচের কাজে লাগে সেই জল। পান করে পাহাড়ী ঝর্ণার জল। নদীর বালিতে খোঁড়া ডাঁড়ির চুয়ানো জল। বড় মিঠা সেই জল। অভাব নেই জঙ্গলে কাঠের। ফল-মূল, লতা-পাতা, শেকড়-বাকড়ের অভাব নেই জঙ্গলে। সুবর্ণরেখা আর খড়কাই এর মাছ। সব মিলিয়ে যেন স্বর্গসুখ অনুভব করত এখানকার বাসিন্দারা।

কবে থেকে এরা এখানে বাস করছে, তা কেউ জানত না। কোথা থেকে এরা এখানে এসেছিল তাও তাদের মনে ছিল না কিন্তু এখানে থেকে এরা ভুলে গিয়েছিল অন্য কোথাও চলে যাবার কথা। আদিম যাযাবর কৃষিজীবি, বনবাসীদের যাযাবর মন

যেন এখানে সাজিয়ে গুছিয়ে সংসার পেতেছিল পরম নিশ্চিন্তে। পাহাড়ের জঙ্গলের মাঝে এদের সুখ ছিল , শান্তিও ছিল নিরবচ্ছিন্ন। শাল, মহুয়া, পিয়াল, পলাশ, ধঅ, ধাধকি, নিম, করঞ্জা, আম, জাম, অর্জুনের জঙ্গলের মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। করমগীতে পাহাড়ী, জংলী মেয়েদের কণ্ঠস্বর পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি তুলত। ডাঁইড় নাচ, পাঁতা নাচ, সহরই-বাঁদনায় মুখর হয়ে উঠত মাতাল মাদল। টুসুগীতে নেচে উঠত সুবর্ণরেখা খড়কাই এর জল। ছৌনাচে ধমসায় পড়ত কাঠি। কুড়মি, কুমহার, গোঁড়, সাঁওতাল, ভূমিজ, কেঁওটদের পায়ের ছন্দে শিউরে কেঁপে উঠত সিংভূমের মাটি।

ভারতবর্ষে তখন ব্রিটিশ শাসন। বিষ্টুপুর, সাঁকচি, মহুলবেড়া, উলিয়ান কদমার সমস্ত এলাকা তখন ধলভূমের রাজা ধওলদেবের জমিদারীর আওতায়। ধলভূমের রাজা ধওলদেবের কাছ থেকে স্টীলপ্ল্যান্ট গড়ার জন্য সতেরোটি মৌজা লিজ নিলেন টাটা কোম্পানী। কুড়মী, কুমহার, গোঁড়, ভূমিজ, সাঁওতাল, হো, কেঁওটরা ধলভূমের জমিদারী থেকে চলে এল টাটা কোম্পানীর জমিদারীর আওতায়। জমিদারের খাসজমি পেয়ে গেলেন কোম্পানী কিন্তু রায়তি সত্ত্ব থাকল প্রজাদের।

খাস জমিতে তৈরি হচ্ছে কারখানা কিন্তু তাতে কোম্পানীর চলে না। গড়ে উঠবে বিশাল কারখানা, সুপরিকল্পিত শহর। গোটা পৃথিবী থেকে লোক আসবে এখানে। এখানে জংলী কুড়মি, কুমহার, গোঁড়দের বস্তি মানাবে না কোনমতেই। জিওলজিস্ট পি.এন.বোসের মেটিরিয়াল পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে জামশেদজী নসরতজী টাটার ছেলে রতন টাটা গড়ে তুলতে থাকেন টাটা আয়রন এন্ড স্টীল প্ল্যান্ট। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে স্টীল সিটি।

কুড়মি, কুমহার, গোঁড়, ভূমিজরা এই ভূমিতে ফসল ফলাত, গরু ছাগল চরাত, করমনাচ, পাঁতানাচ, ছো-নাচ নাচত কিন্তু জানত না এই ভূমির নীচে রয়েছে সোনার ডিম অফুরন্ত। একটা দুটো করে হাজার চিমনির ধোঁয়া উঠতে লাগল আকাশে। লাল, নীল, হলুদ, বেগুণী হাজার রকমের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল আকাশ।

বাদাম পাহাড়, নোয়ামুন্ডি, মনোহরপুরে আয়রন ওর, জাদুগোড়ায় ইউরেনিয়াম, ঘাটশিলা মুসাবনির কপার, খরসোঁয়ার লিগানাইট কাইনাইট, চান্ডিলের পাথর, সুবর্ণরেখার কুঁদরুকচার সোনার সন্ধান পেয়ে চারপাশ থেকে আসতে লাগল, হাজারে হাজারে লাখে লাখে লোক। বিষ্টুপুর সাঁকচি ইত্যাদির শহর এলাকাকে সব মিলিয়ে লর্ডস চেমসফোর্ড ১৯০৯ সালে নামকরণ করলেন জামশেদপুর। কালিমাটি ষ্টেশনের নাম দিলেন টাটানগর। জামশেদপুরের বর্তমান লোকসংখ্যা ১১ লক্ষের মত। কিন্তু বিষ্টুপুর সাঁকচি, কদমা উলিয়ানের কুড়মি, কুমহার, গোঁড়, ভূমিজ সাঁওতাল কেঁওটরা এখন কোথায় কে তার হদিস দেবে!

কোম্পানীর জমিদারী

ভারতবর্ষে তখন ইংরেজ শাসন। ভারত স্বাধীন হয় তারও অনেক পরে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। ১৯১২-১৭ সালে টাটা কোম্পানী ধলভূমের রাজা ধওলদেবের কাছ থেকে স্টীল প্ল্যান্ট গড়ার জন্য ১৭টি মৌজা লিজ নেয়। এই সতেরোটি মৌজার খাস জমি পেয়ে যায় কোম্পানী কিন্তু অধিবাসীদের রায়তি সত্ত্ব থেকে যায়। তাদেরকে বিধিবদ্ধভাবে সরাতে হলে জমির ক্ষতিপূরণ পূনর্বাসন ইত্যাদি কথা গুলো ভাবতে হয়। কিন্তু তাতে কোম্পানীর অনেক টাকার ক্ষয়ক্ষতি। টাটা কোম্পানী এখানে ব্যবসা করতে এসেছে, লাভের কড়ি ঘরে তুলতে এসেছে। তাছাড়া কোম্পানী তো এখন জমিদার। কুড়মি, কুমহার, সাঁওতাল, মুড়া, গোঁড়, কোল, কেঁওটরা কোম্পানীকে খাজনা দেয়। ওদের ওপর অতটা ভদ্র ব্যবহারের কথা ভাবা অর্থহীন।

টাটা কোম্পানী এখন জমিদার। দু-চারশো লাঠিয়াল না পুষলে জমিদারী ঠিক মানায় না। আজ বিষ্টুপুরে শহর বাড়বে, তারপরের দিন সিধগোড়া, বারিডি, কদমায় অন্যকোন কোম্পানী এসে কারখানা গড়বে, পরশু মহুলবেড়া সাঁকচিতে শহর বাড়বে কারখানা বাড়বে, কোম্পানীর হরেক রকম বাহানা। কোম্পানীর নোটিশ যায় গ্রামবাসীদের কাছে তোমরা এখান থেকে কেটে পড়।

জমির মায়া, ক্ষেতির মায়া কুড়মি, কুমহার, গোঁড়দের কাছে সাংঘাতিক। কবে থেকে তারা আচোটা পতিত জমিতে জঙ্গল সাফ করে চাষযোগ্য জমি তৈরী করেছে। সিংভূমের বাঘ ভালুক, হাতির সঙ্গে লড়াই করে বসতি তৈরী করেছে, জমিদার কোম্পানীর চঁথা কাগজের নোটিশে তার কেমন করে ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করে চলে যাবে! একি হতে পারে! কুড়মি কুমহারদের কাছে এযেন দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়। কিন্তু এর প্রতিকার প্রতিবাদের ভাষাও তাদের জানা নেই। কেমনকরে তারা রাজা ধওলদেবের কাছ থেকে চলে এল কোম্পানীর রাজত্বে তাও তারা বুঝতে পারে না। বোবা চোখে তাকিয়ে থাকে কোম্পানীর নোটিশের দিকে। কাগজের গায়ে আঁকাবাঁকা হরফের অর্থ তাদের মাথায় ঢোকেনা। কিন্তু যখন ভোরবেলা কিংবা মাঝরাতে হঠাৎ দু-চারশো লাঠিয়াল গ্রামে এসে ঢোকে, নির্মমভাবে পেটাতে শুরু করে তখন তারা বুঝতে পারে এটা কোম্পানীর জমিদারী এই জমি এই মাটি যেখানে তারা ক্ষেতি করেছে, বাড়ি করেছে, এটা ওদের না, এটা কোম্পানীর, কোম্পানী এখানে কারখানা করতে পারে অন্য লোক এনে বসাতে পারে যা খুশী করতে পারে, এখান থেকে ওদের চলে যেতে হবে।

চলে যেতেই হবে এটা ওরা বেশ বুঝতে পারে। চলেও যাবে ওরা। কিন্তু কোথায় যাবে? কোথায় যেতে হবে কোথায় যাবে তারা এটা কেউ বাতলে দেয় না। কোম্পানীর লাঠিয়ালরা ওদেরকে পিটতে পিটতে কখনও সূবর্ণরেখার ওপারে কখনও বা খড়কাই এর ওপারে রেখে আসে। কিন্তু কোথায় যাবে, কে বলে দেবে তাদের! এতদিনের সুখ দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত বাপ-ঠাকুরদার ভিটেমাটির মায়া কেমন করে ছাড়বে তারা। কেউ কেউ ফিরে আসে আবার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। দেখতে পায় শ্মশান

হয়ে গেছে তাদের সাধের ঘরকন্না। বুক জুড়ে বোবা কান্নায় অব্যক্ত যন্ত্রণা।

ফিরে ফিরে আসে ওরা ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করতে পারে না। গবাদি পশুর মত বোবা চোখে তাকিয়ে থাকে। আবার আসে কোম্পানীর গুণ্ডা, মার লাগায়, প্রচণ্ড মার। গর্ভবতী কুড়মী, কুমহার, ভূমিজ, সাঁওতাল, গোঁড়, কেঁওটদের বধূর পেটের বাচ্চা অসময়ে বেরিয়ে আসে পেট থেকে মারের চোটে। নির্মলকে এসব কথা বলে উলিয়ানের বয়স্ক যারা, কেদার মাহাতর মত লোকেরা। ওরা যতটা জানে ততটাই বলে। বাকিটা বলে সুবর্ণরেখা আর খড়কাই এর কল্‌কল্‌ ধ্বনি। যুগযুগ ধরে ওরা দেখছে। যুগ-যুগান্তরের ইতিহাসের সাক্ষী ওরা।

এক একদিনে একেকটা গ্রাম উচ্ছেদ হতে থাকে। দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনে প্রায় পঙ্গু মানুষগুলি কেউ কেউ চলে যায় যে যার পারিবারিক আপুস কুটুমের বাড়িতে দূর-দূরান্তে। কোন কোন পরিবার আশ্রয় নেয় জামশেদপুরেরই আশেপাশের বস্তিতে। ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের দাবী তাদের মনে আসে না।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে জমিদারী সত্ত্ব বিলোপ হোল কিন্তু কোম্পানীর জমিদারী এখনও অটল। উলিয়ান কদমা বাড়া জজবেড়ার বাসিন্দারা তখনও বারবার কোম্পানীর নোটিশ পাচ্ছে। কোম্পানীর কারখানার পরিধি বাড়বে শ্রমিকদের কোয়ার্টার তৈরি হবে, শহর বাড়বে তোমরা সরে পড়। ছেড়ে দাও তোমাদের গ্রাম। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে নির্মলের বাবা জগবন্ধু মাহাত এবং আরও বত্রিশজন কোর্টে মামলা দায়ের করেন কোম্পানীর বিরুদ্ধে। মামলায় জিতে যান তারা। তারপর থেকে উলিয়ান, কাশিডি, সোনারী, ধাধকিডি, খুঁটাডি, বেলডি, বারিডি, ব্যাটা, গমরিগাড়া, ভাটিয়াবস্তি, নীলডি, বালিচালা, বাড়া, জজবেড়া ইত্যাদি সতেরোটি বস্তির বাসিন্দারা, বিহার সরকারের প্রজা হয়ে যান। কোম্পানী জমিদারের পাইক বরকন্দাজ, লাঠিয়াল, গোমস্তা নায়েব, দালাল, অফিসারদের অত্যাচার থেকে তারা বেঁচে যান। বেঁচে যান যখন তখন কোম্পানীর গ্রাম ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ থেকে। অনিশ্চিত এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের আতঙ্ক থেকে রেহাই পেয়ে যান তাঁরা।

মনোভূমি

কেদার মাহাতদের মত বয়স্কদের কাছ থেকে ডাক্তারবাবুর মত লোকেদের কাছ থেকে বাবা জগবন্ধু মাহাতর কাছ থেকে, সুবর্ণরেখা আর খড়কাই এর কলধ্বনিতে নির্মল শুনত জামশেদপুরের ইতিহাস। কেমন করে কুড়মি, সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাও, হো গোঁড়, কেঁওটরা নিজের মাতৃভূমি থেকে উৎখাত হয়ে হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে, চলে যেতে বাধ্য হয়েছে দূর-দূরান্তে। এটা শুধু জামশেদপুরের ইতিহাস নয়। এই ঘটনা আজও অহরহ ঘটে চলেছে গোটা ঝাড়খন্ড এলাকা জুড়ে। ঝরিয়া ধানবাদ, মারাফরি, বোকারো, হাটিয়া, রাউরকেল্লা, ভিলাই, দুর্গাপুর, আসানসোলের চিমনি গ্রাস করেছে, কতশত আদিবাসী গ্রাম; কতলক্ষ মূলবাসী, আদিবাসী পরিবারকে

করেছে বাস্তুহারা কে তার হিসেব দেবে? উলিয়ান, কদমা, সাঁকচি, সোনারী, বিষ্টুপুরের বাসিন্দারা যেমন কোম্পানীর কাছে সুবিচার পায়নি, তেমনি গোটা ঝাড়খন্ডের লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারারা কেউ পায়নি সুবিচার।

জামশেদপুর এলাকার সতেরোটি মৌজার কয়েক হাজার মানুষের বদলে এখন জামশেদপুরের বাসিন্দা ১১ লক্ষের বেশী। টাটা কোম্পানীর চল্লিশ হাজার কর্মীর মধ্যে আটত্রিশ হাজারই এসেছে বাইরে থেকে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, গোটা ভারতবর্ষ থেকে, এসেছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে। দু-হাজার স্থানীয় কিছু লোক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে।

নির্মলের মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, কুড়মি, সাঁওতাল, কুমহার, ভূমিজ, হো, গোঁড়, কেঁওটরা কি মানুষ নয়? এরা শুধু হারাবে, পাবে না কিছুই! জন্ম লগ্ন থেকেই যারা শ্রমিক তাদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করতে কোথায় বাধা! হতে পারে এরা অদক্ষ শ্রমিক কিন্তু দক্ষ শ্রমিকে এদের পরিণত করা কি অসম্ভব! নির্মল একটু একটু করে বোঝে একটু একটু করে খুঁজে পায় একটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের সূত্র। দেখতে পায় গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র আর মানবতাবাদের পূজারীদের মুখোশে ঢাকা মুখের আড়ালে এক বিভৎস জানোয়ারের ভয়ংকর মুখচ্ছবি। কেদারবাবু ডাক্তারবাবুরা বলেন ১৯৩১ সাল পর্যন্ত কুড়মিরা, কুড়মি-মাহাতরা আদিবাসী তালিকায় আদিবাসী হিসেবে চিহ্নিত ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে সেখান থেকে এদের হাটিয়ে দেওয়া হল। এর গভীরেও একটা জঘন্য চক্রান্ত ছিল। কৃষিজীবি কুড়মিদের কাছে জমির মায়া সাংঘাতিক মায়া। প্রবাদ আছে 'জঁদে জঁদে পানিক সত্ তঁদে তঁদে কুড়মিক জট।' অর্থাৎ যেখানেই জলের স্রোত আছে, চাষের জন্য জল আছে কৃষিজীবি কুড়মিদের সেখানেই বসতি। এরা বনকেটে পাহাড় কেটে তৈরি করেছে চাষযোগ্য জমি। না খেয়ে আধপেটা খেয়েও এরা জমির মালিকানা চায় ফসল ফলানোর জন্য। তাই ছোটনাগপুর, সাঁওতাল-পরগণা বা ঝাড়খন্ডের কৃষিযোগ্য জমির কিয়দংশের মালিকানা এদের হাতে।

আদিবাসী কুড়মিদের সেই জমির মালিকানা থেকে হঠাতে বিস্তর বেগ পেতে হবে সরকারের আর টাটা কোম্পানীর মত জমিদারদের এবং সরকার যাঁরা চালান তাঁদের। অথচ গোটা ঝাড়খন্ড এলাকা জুড়েই কুড়মিদের খেতিবাড়ি এবং গোটা ঝাড়খন্ডের মাটির নিচেই আছে অফুরন্ত খনিজ রত্ন ভান্ডার। সুতরাং আদিবাসী তালিকা থেকে কুড়মিদের হটিয়ে দেওয়া হোক। কেদারবাবুরা ডাক্তারবাবুরা বলেন কুড়মিদের আদিবাসী সূচী থেকে হটানোর জন্য সেই সময়কার পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা সরকারের কর্তাব্যক্তিদের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল।

এতে ওদের অনেক লাভ। প্রথম লাভ কারখানা তৈরির জন্য, নদীবাঁধ তৈরির জন্য কুড়মিদের হাত থেকে বিনা বাধায় কেড়ে নেওয়া যাবে প্রয়োজনীয় জমি। আদিবাসী সূচী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য চাকরির দাবীদার হতে পারবে না এরা, শিক্ষাক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে এরা

এবং দীর্ঘস্থায়ী লাভ ঝাড়খন্ডী আদিবাসীদের মধ্যে অঙ্কুরিত হবে বিভেদের বীজ। জমির মালিকানা নিয়ে সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, হো, খাড়ীয়াদের সঙ্গে বাধবে সংঘাত। যাতে এরা একত্রিত হতে পারবেনা কোনদিন। ভবিষ্যতের আলাদা রাজ্যের আন্দোলন, আদিবাসীদের জন্য আলাদা ভূখন্ডের আন্দোলনও দানা বাঁধতে পারবে না কোনদিন।

খ্রীষ্টানদের যীশু আছে মুসলমানদের হজরত মহম্মদ আছে, হিন্দুদের রাম আছে কৃষ্ণ আছে, শিখদের নানক আছে, বৌদ্ধদের গৌতম বুদ্ধ আছে, জৈনদের মহাবীর, সাঁওতালদের সিধু-কানু, মুন্ডাদের বীরসা ভগবান আছে, কুড়মিদের কেউ নেই। মুন্ডাদের বিরসা ভগবানের মত ভগবান, সাঁওতালদের সিধু কানুর মত ভগবান, খ্রীষ্টানদের যীশুখ্রীষ্টের মত কুড়মিদের যীশু হওয়ার বাসনা এমনি করে ধীরে ধীরে নির্মলের মনের মধ্যে গেড়ে বসেছিল।

কিন্তু সুবর্ণরেখা আর খড়কাই এর কল্লোলধ্বনি নির্মলকে অন্য কথা বলেছিল। সিধু কানু সাঁওতালদের মেরে বাঁচিয়েছিল দিতে পেরেছিল একখন্ড জমি সাঁওতাল পরগণা, বীরসা মুন্ডা মুন্ডাদের মেরে বাঁচিয়েছিল, কোলেরা ওঁরাওরাও ওদের জন্য লড়াই করেছিল কিন্তু দিন বদলেছে এখন শুধু কুড়মিদের যীশু হওয়ার দিন নয়। তোমাকে হতে হবে সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাও, হো, খাড়িয়া, বীরহোড়, কামার, কুমহার, হাড়ি, মুচি, ডোম, মেথর, রাজেয়াড়, ঘাটোয়াল, ঘাসি, তুরি, বেদিয়া, জোলাতাঁতি ইত্যাদি কৃষিজীবি, শ্রমজীবি, বৃত্তিজীবি, বনবাসী মানুষদের সবার যীশু। নির্মল তাই হতে চাইল।

ও শুধু কুড়মিদের যীশু হতে চাইল না, ঝাড়খন্ডের মূলবাসী, আদিবাসী, বৃত্তিজীবি হরিজন, গিরিজন, সবার যীশু হতে চাইল। বঞ্চিত নিপীড়িত নির্যাতিত শোষিত, অপমানিত মানুষদের সবার জন্য ও নিজেকে উৎসর্গ করল। উলিয়ানের কদমার, সোনারীর লোকেরা আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবরা নির্মলকে সাধারণ একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবেই দেখত। কিন্তু একদিন ওরা বুঝতে পারল নির্মল কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল। নির্মলের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সেদিন গোটা ঝাড়খন্ড থেকে মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, বুড়ো কাতারে এসে জড়ো হচ্ছিল জামশেদপুরে। কৃষিজীবি শ্রমজীবি মানুষদের চোখের জলে যেদিন ভিজছিল জামশেদপুরের উলিয়ানের মাটি, হাজার হাজার নরনারীর চোখের জলে যেদিন ভারী হয়ে গিয়েছিল জামশেদপুরের আকাশ বাতাস সেদিন ওরা বুঝতে পেরেছিল নির্মল যীশু হয়েছে, নির্মল, উলিয়ানের নির্মল, ঝাড়খন্ডের যীশু।

সমুদ্র মন্থনের বিষ আজও

নির্মল এখন আর সেই ছোট্ট নির্মল নেই। ছফুট লম্বা সুগঠিত দেহের অধিকারী নির্মল যদিও সর্বদায় হাসিখুসিতে উচ্ছল তবু কেমন যেন আনমনা। অন্য কেউ বুঝতে না পারলেও ধরা পড়ে মায়ের চোখে, দিদি শান্তির চোখে, বন্ধু পিসতুতো ভাই সুনীলের

চোখে।

ছোটবেলা থেকেই সোনারীর রাস্তায় টাটা কোম্পানীর ভাঙা পীচের রাস্তা ধরে শালবনের ফাঁকে ফাঁকে সুবর্ণরেখা আর খড়কাই এর মিলনস্থল দোমহনীতে যায় নির্মল। কোন কোনদিন সঙ্গে থাকে সুনীল। গল্প করতে করতে যায় দুজনে। কোনদিন একা। বিকেলের রোদ কমতে কমতে সন্ধ্যা নামে। শালগাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসে থাকে নির্মল, দলমা পাহাড়ের জঙ্গলের উপর চোখ রেখে দোমহনীর জলের উপর চোখ রেখে।

বাড়ী ফিরতে গিয়ে দেখে, দলমা পাহাড়ের কোল ঘেঁসে, সুবর্ণরেখা আর খড়কাই এর তীরে তীরে দেওয়ালী উৎসবের মত আলোর মালায় সেজেছে জামশেদপুর শহর। টেলকো, টিসকো, কেবল, জেমপোর চিমনির আগুনে বহুবর্ণ রঙ ধরেছে আকাশে। লাল, নীল, হলুদ, বেগুনী, হরেক রঙের ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশটাকে ছেয়ে ফেলছে। চিমনির মুখে আগ্নেয়গিরির লাভার মত জ্বলন্ত আগুন।

হাঁটতে হাঁটতে এক অন্য জগতে চলে যায় নির্মল। মানসচক্ষে দেখতে পায়, পাহাড় জঙ্গল ঘেরা একটা ভূখণ্ড যাকে কখনও বলা হয়েছে ঝাড়খণ্ড, কখনও ছোটনাগপুরের মালভূমি, কখনও জঙ্গলমহল, কখনওবা অন্যকিছু। মাটির নীচে অফুরন্ত খনিজ ভান্ডার। গোটা এলাকা জুড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে লক্ষ লক্ষ চিমনি। রঙ বেরঙ এর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে আকাশ। বিষাক্ত ধোঁয়া একটু একটু করে গ্রাস করছে গোটা এলাকাটাকে।

সমুদ্রমন্থনের গল্পটা অনেক পুরানো হয়ে গেছে। বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গেছে গল্পটা, কিন্তু মূল্যহীন হয়ে পড়েনি। নির্মলের কাছে গল্পটা আরও মূল্যবান আরও অর্থবহ হয়ে ওঠে। সমুদ্র মন্থনের সময় দেবতারা ধরেছিল বাসুকীর লেজের দিকটা অসুররা মুখের দিকটা। সমুদ্র মন্থনে বিষ ও অমৃত দুইই উঠল। বিষ্ণু ছল করে অমৃতের ভাঁড় নিয়ে পালাল। দেবতারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল অমৃত। অসুরদের জন্য পড়ে রইল প্রাণঘাতী হলাহল। শিবকে নীলকন্ঠ হতে হল সেই বিষ পান করে। সৃষ্টি বেঁচে গেল ধ্বংসের হাত থেকে।

জামশেদপুরের চিমনির ধোঁয়া থেকে গোটা ঝাড়খন্ডে চিমনির ধোঁয়া দেখতে পায় নির্মল। সমুদ্রমন্থনের যে বিষ তাই যেন চিমনির ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে আসছে অহরহ। কলকারখানায় যারা উৎখাত হচ্ছে তাদের কেউ কেউ চাকরি পাচ্ছে, পাচ্ছে উৎপাদনের বা অমৃতের ছিঁটে ফোঁটা। কিন্তু গোটা ঝাড়খণ্ডের হাজার হাজার চিমনির ধোঁয়া, সমুদ্র-মন্থনের বিষ হজম করতে হচ্ছে ঝাড়খণ্ডের লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে। অমৃতের ভাগীদার উৎপাদনের অংশীদার হতে পারছে না তারা কোনমতেই।

নির্মল ভাবে, ছোটনাগপুরের কৃষিজীবি, শ্রমজীবি, বনবাসী মানুষেরা কি করে বাঁচবে অমৃতের ভাগ থেকে বঞ্চিত হয়ে, উৎপাদনের অংশীদার হতে না পেরে এই গরল তারা কিভাবে হজম করবে। এরা তো নীলকন্ঠের মত শক্তিধর নয় যে গলায়

বিষ ধরে রেখে নীলকণ্ঠ হয়ে যাবে। বাঁচবেনা, বাঁচতে পারে না এরা।

নির্মল যেন দেখতে পায় রত্নগর্ভা ছোটনাগপুরের প্রতিটি কৃষিজীবি শ্রমজীবি পরিবারের সংসার তাসের ঘরের মতই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার আশায় দিন গুনছে। যে কোন মুহুর্তেই যে কোন গ্রামকে উচ্ছেদ করা হতে পারে। করখানা বানানোর জন্য বাঁধ তৈরী করার জন্য কিংবা অন্য কিছু করার জন্য। ব্যাঘ্রপ্রকল্পের জন্যও কয়েকশো আদিবাসী গ্রামকে নির্দ্ধিধায় উঠিয়ে দেওয়া যায়। কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, বনবাসী, বৃত্তিজীবী, কুড়মি, সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাওরা উৎখাত হয়ে কোথায় চলে যাবে কেউ তার খবর রাখবে না। পরিবর্তে কোলকাতা, পাটনা, ভূবেনশ্বের থেকে আসবে হাজার হাজার লোক।

নির্মল মানুষে মানুষে বিভেদ মানে না। কিন্তু ওর যেন মনে হয় সেই পুরনো দিনে দেবতা আর অসুরের মধ্যে যেভাবে বিভেদ টানা হয়েছিল এখনও যেন সেটাই কারা অতি সুকৌশলে বাঁচিয়ে রেখেছে। তা নাইলে একদল সর্ব্বস্ব হারায় এবং একদল চাওয়ার অতিরিক্ত পায় কেন? নির্মল ভাবে ভাবতে ভাবতে কোন কুল কিনারা পায়না। হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী পৌঁছায়, ভাইদের মাঝে বন্ধু বান্ধবদের মাঝে, আবার যেন নিজেকে ফিরে পায় ও। খুশি আর আনন্দে উচ্ছল নির্মল তখন যেন অন্য মানুষ।

চাই সুসংগঠিত জন আন্দোলন

শুধু জামশেদপুর নয় সিংভূম নয়, মানভূম, রাঁচী, হাজারিবাগ, পালামৌ, গিরিডি, ধানবাদ, সাঁওতাল পরগণা, ময়ূরভঞ্জ, কেঁওঝার, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, এককথায় গোটা ঝাড়খণ্ড এলাকা জুড়ে চলছে সুপরিকল্পিত জুলুম, অত্যাচার,শোষন। ঝরিয়া, ধানবাদ, মারাফিরি, বোকারো, চান্ডিল, হাটিয়া, রাউরকেল্লা, ভিলাই এর খনি এবং শিল্পাঞ্চল জুড়ে চলেছে কোটি কোটি টাকার লুঠতরাজ, মাফিয়ারাজ, গুন্ডারাজ। ভূমিপুত্ররা নির্বাসিত হচ্ছে, উৎখাত হচ্ছে, পিতৃপিতামহের ভিটেমাটি থেকে। আসছে গোটা ভারতবর্ষ থেকে লোক। পশ্চিমবঙ্গ বিহার উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দারা বাসা বাঁধছে ছোটনাগপুরের খনি আর শিল্পাঞ্চলের আশেপাশে। সমুদ্র মন্থনের অমৃতের অধিকারী তারাই। এখানকার কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষেরা সর্বস্ব খুইয়ে হচ্ছে সর্বহারা। এদের ন্যায্য অধিকার কায়েম করতে একটা নির্মল নয় চাই হাজার হাজার নির্মল। চাই সুসংগঠিত জন আন্দোলন।

জামশেদপুরের আশেপাশের বাসিন্দারা যেমন মার খেয়েছে। জমিজমা ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে বুক চাপড়াচ্ছে, তেমনই ঝরিয়া, ধানবাদ, মারাফরি, বোকারো, সাঁওতালডির ভূমিপুত্ররাও নামমাত্র ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছে জমি, পারেনি সংগঠিত হয়ে আন্দোলনে সামিল হয়ে অমৃতের ভাগ আদায় করে নিতে।

মানুষ এসেছে, বিষম সংস্কৃতির মানুষ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত ধরে দালাল

হয়ে সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত হাজার হাজার লাখে লাখে এসেছে খনি আর শিল্পাঞ্চলে। বিপন্ন হয়ে পড়েছে শুধু ছোটনাগপুরের অথানীতি নয় ভাষা সংস্কৃতি রাজনীতি , ধর্ম জীবন জীবিকা। শুধু অর্থনৈতিক পঙ্গুতা নয়, ভাষা সংস্কৃতি জীবনযাত্রা মূল্যবোধ সবকিছুই যেন হারিয়ে যেতে বসেছে এদের। শুধু মাত্র অর্থনৈতিক দাসত্ব নয়, উন্নত জাতিসত্তার মানুষেরা সুকৌশলে পরিয়েছে এদের পায়ে সাংস্কৃতিক দাসত্ব। নির্মল ভাবে এর শেষ কোথায়, সমাধান কি? ভাবনার অতল তল থেকে একটাই প্রতিধ্বনি উঠে আসে চাই সুসংগঠিত জন আন্দোলন। জগন্নাথ ধল, গঙ্গানারায়ন সিংহ, সিধু, কানু চাঁদ ভৈরব তিলকা মাঝিরা ভেবেছিল একথা ভেবেছিল অনেক আগেই। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে তখনও কোন বিদ্রোহই হয়নি। ১৭৬৫ সালে ধলভূমের জগন্নাথ ধলেরা ১৮৫৫-৫৬ সালে সিধু কানুরা বিদ্রোহ ঘোষনা করেছিল। ওরা বলেছিল এটা আমাদের ভূমি এখানে অন্য কারও শাসন মানব না। ওরা চেয়েছিল আদিবাসীর জন্য একখণ্ড ভূমি যেখানে তারা নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ আর অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে গোটা সাঁওতাল সমাজ সহ অন্যান্য দেশজ সমাজকে।

ছোটনাগপুরের 'ধরতীআবা' ভগবান বিরসা মুন্ডা, ধানী মুন্ডারাও ভেবেছিল তাই মুন্ডাদের জন্যে একখন্ড ভূমি, কোলরা ওঁরাওরা সকলেই আলাদা আলাদা করে ভেবেছিল এটা। অনেক রক্ত ঝরিয়ে তা তারা কায়েম করেত পারেনি। তবে সিধু কানুরা সাঁওতালদের বিরসা মুন্ডা, ধানীমুন্ডারা মুন্ডাদের, কোলবিদ্রোহীরা কোলদের ওঁরাওরা ওঁরাওদের মরতে শিখিয়েছিল, লড়াই করতে শিখিয়েছিল, সংগঠিত হতে শিখিয়েছিল। সিধু, কানু, চাঁদ ভৈরব, বিরসা মুন্ডা, ধানী মুন্ডারা সবাই যীশু হয়ে গেল কিন্তু কায়েম করতে পারল না তাদের সমাজের লোকেদের জন্য এক খণ্ড ভূমি,শুধু দিয়ে গেল যীশু হওয়ার মন্ত্র।

সিধু, কানু, বিরসা মুণ্ডা, কোলদের, হোদের, ওঁরাওদের আন্দোলনের পর শোষনের জাঁতাকলটা আরও জোরে চেপে বসল। গোরা সাহেবদের থেকে কালা সাহেবরা এব্যাপারে বেশী বই কম যায় না। ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা, ঝাড়খণ্ডের এরা ভাগ করে নিল পশ্চিমবঙ্গ,বিহার উড়িষ্যা আর মধ্যপ্রদেশের মধ্যে লর্ড কার্জনের সহায়তায়। এখন সমস্যাটা আরও গভীরে। এখন আর সাঁওতালদের জন্য, মুণ্ডাদের জন্য, ওঁরাওদের জন্য, কোলদের জন্য, কুড়মিদের জন্য আলাদা করে কিছু ভাবা যাবে না। সবাইকার সমস্যা এখন এক। এদের সবার জন্য এখন ভূমির বড় প্রয়োজন। কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, বৃত্তিজীবী, বনবাসী মানুষেরা সবাই আজ একই সমস্যার সম্মুখীন। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই-এ এদেরকে সবাইকে সামিল করতে হবে। নির্মল এটা ভাবতে থাকে।

যদিও এরা একই সংস্কৃতি, একই ভৌগলিক পরিমণ্ডল, একই রকম সামাজিক কাঠামো জীবনযাত্রা, মূল্যবোধের অধিকারী তবু ঐক্যের অভাব। একজন ফুটপাতের

বাসিন্দাকে একজন ঝুপড়িবাসী যেভাবে অবজ্ঞা করে, একজন কৃষক, একজন বৃত্তিজীবীকে সেইভাবে অবজ্ঞা করে, একজন মুচি একজন ডোমকেও সেইভাবে অবজ্ঞা করে সেই ভাবেই একজন আদিবাসী আর একজন আদিবাসীকে অবজ্ঞা করে। এদের এই ক্ষুদ্রতা ঘোচাতে হবে। ছোটনাগপুরের আদিবাসী, হরিজন, গিরিজন, হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টানদের সমস্ত কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, বৃত্তিজীবী, বনবাসীকে একসূত্রে গাঁথতে হবে। বড় কঠিন সেই কাজ। নির্মল যোগ দেয় ঝাড়খণ্ড পার্টিতে।

ঘটনা, দুর্ঘটনা ও জীবন

মানুষের এমন কিছু ঘটনা বা দুর্ঘটনা অনেক সময় ঘটে যাতে তার জীবনে, জীবনযাত্রা, মূল্যবোধ সবকিছুর মধ্যেই আমূল পরিবর্তন ঘটায় বা তার সমস্ত কিছুকেই প্রভাবিত করে। নির্মলের জীবনেও এরকম একটা ঘটনা শান্ত শিষ্ট নিরীহ নির্মলকে শহীদ নির্মল বা ঝাড়খণ্ডের যীশু হতে সাহায্য করল। তবে যাদের জীবনে এরকম কিছু ঘটে তারা কি সবাই শহীদ নির্মল যীশু নির্মল হতে পারে! হয় না, নির্মলরা যীশুরা নির্মল হয়েই জন্মায় যীশু হয়েই জন্মগ্রহণ করে।

১৯৬৮ সালে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করা পর্যন্ত পিসতুতো ভাই সুনীল ও নির্মল একই সঙ্গে এক ক্লাসেই পড়াশুনা করেছে। দুজনে গলায় গলায় ভাব। ওরা প্রায় সমবয়সী। হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করার পর সুনীল চাকরি পায় টিসকোতে। দুজনের সবসময়ের ঘোরাফেরায় ছেদ পড়ে খানিকটা। নির্মল ভর্তি হয় জামশেদপুর ওয়ার্কার্স কলেজে। কো-এডুকেশন স্কুল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন হাইস্কুলে নির্মল অত্যন্ত লাজুক। মেয়েদের থেকে সবসময় নিজেকে গুটিয়ে রাখে। পড়াশুনায় অত্যন্ত মনোযোগী ছাত্র নির্মল কলেজে গিয়ে দল পাকাতে শুরু করে। কিন্তু পড়াশুনা বাদ দিয়ে নয়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে, টেলকো, টিসকো, টিনপ্লেট, কেবল্ উইয়ার, জেমপোতে চাকরি করতে এসেছে লোকেরা। তাদের ছেলেরা পড়াশুনা করে জামশেদপুরের স্কুল কলেজগুলিতে। নির্মলের মত গ্রামের ছেলেরা কোনক্রমে পড়ার সুযোগ পায়। তাতেও আরা, ছাপরা, পাটনার-বিহারীদের কোলকাতা চব্বিশ পরগনার বাঙালীদের, ভুবনেশ্বর কটকের উড়িয়াদের গাত্রজ্বালা হয়। ওদের ভাষায় জংলী, জানোয়ার, সাঁওতাল, কুড়মীরা কেন আসে লেখাপড়া শিখতে!

নির্মল দল পাকায় 'জংলী, জানোয়ার, গাঁওয়ার, ছাত্রদের নিয়ে। ছেলেরা বলে, ওরা আমাদের জংলী জানোয়ার গাঁওয়ার বলে কেন? নির্মল বলে, ঠিকই তো বলে, জঙ্গলে যারা থাকে তাদের বলা হয় জংলী, গ্রামে যারা থাকে তাদেরকে বলে গাঁওয়ার, পশুর মত আমরা খেটে মরি কিন্তু নিজের অধিকার বুঝে নিতে জানি না। ওরা আমাদের এতদিন জানোয়ারের মতই চাবুক মেরে রেখেছে তাই ওরা আমাদের বলে জানোয়ার। আমরা জানোয়ার নই, আমাদের মাটিতে বসে আমাদেরই বুকে বসে যতদিন ওরা আমাদের দাড়ি ওপড়াতে পারবে ততদিন ওরা আমাদের মানুষ হিসাবে স্বীকার করবে

না বলবে জানোয়ার।

কলেজ ইউনিয়ন থেকে সংঘাত শুরু গায়ের জোরের বদলে গায়ের জোর, মারের বদলে মার। নির্মলের নামে আতঙ্ক ছড়ায়। জংলী, জানোয়ার গাঁওয়াররা নির্মলের কাছে পায় নির্ভয় আশ্রয়। যেখানেই জুলুম, অত্যাচার সেখানেই হাজির নির্মল। টাটা কোম্পানীর আবির্ভাবের লগ্ন থেকেই জামশেদপুরে শুরু হয়েছে গুন্ডারাজ। উত্তরাধিকার সূত্রে এখনও চলে আসছে তাই। ওরা বোঝে এখানকার মাটিতে শোষনের পরম্পরা কায়েম রাখতে হলে, মারের চোটে এই জংলী, জানোয়ার গাঁওয়ারদের শিরদাঁড়া ভেঙে দিতে হবে যেন ভবিষ্যতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। স্কুল জীবন থেকেই নির্মল এই গুণ্ডারাজকে জামশেদপুর থেকে উৎখাত করতে চায়।

১৯৭০-৭১ সালে নকশাল আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশ জুড়ে। জামশেদপুরে কদমা উলিয়ানে বাড়তে থাকে নকশালিষ্ট ছেলেদের আনাগোনা। ধীরে ধীরে উলিয়ান বস্তিতে গড়ে ওঠে নকশালদের শক্ত ঘাঁটি। উলিয়ানের অনেক ছেলেই জড়িয়ে পড়ল নকশাল আন্দোলনে। নির্মলকে ওরা চাইত, দলে টানার অনেক চেষ্টা করত। কিন্তু নির্মল তেমনভাবে এগিয়ে আসেনি। ওরা গরীবদের স্বপক্ষে পুঁজিপতি, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলে নেবার কথা বলত। নির্মলের ভালো লাগত। ওদেরকে অনেক কাছের মনে হোত কিন্তু তবু নির্মল তাদের সঙ্গে তেমনভাবে জড়িয়ে পড়ল না। হয়তো বা জড়িয়ে পড়েছিল ভেতরে ভেতরে কিন্তু তা প্রকাশ পায়নি। নির্মল নকশাল ছেলেদের আশ্রয় দিত। বিভিন্ন ভাবে ওদের সাহায্য করত।

১৯৭১ সালে পুলিশের ইনফর্মার বীরেন সরকারকে হত্যা করা হোল। নক্সালদের শক্ত ঘাঁটি উলিয়ানের উপর নজর পড়ল পুলিশের। শুরু হোল ধরপাকড়। উলিয়ানের পুঁজিপতি সব্রত মুখার্জী হত্যার ঘটনায় জড়িয়ে পড়ল পিসতুতো ভাই সুনীল। অনেকগুলো মামলায় জড়িয়ে পড়ল নিজের ভাই সুধীর। নির্মল অবশ্য জড়ায়নি। সুধীরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। সুনীল আর সুধীরকে মামলাগুলো থেকে বাঁচানোর জন্য ছুটে বেড়াতে থাকল নির্মল। টিসকোর কিছু কর্মী আপ্রেন্টিস হিসেবে এসেছিল। কদমার কোয়ার্টারে তারা থাকত। উত্তরবিহারী এই কর্মীরা দলবেঁধে অত্যাচার চালাচ্ছিল গ্রামবাসীদের উপর। পুলিশ ওদের কিছু করত না পুলিশের সঙ্গে আঁতাত ছিল ওদের। আশেপাশের গ্রামের মেয়েদের উপর অত্যাচার শুরু করেছিল ওরা। আসলে এরকম ঘটনা ছিল জামশেদপুরের নিত্ত নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু তখন নির্মলের মত, রুখে দাঁড়াবার মত সাহস তেমন কারুর ছিল না। উলিয়ানের আশেপাশের বস্তিগুলি থেকে নির্মল ততক্ষণে একটি দল তৈরী করে ফেলেছে। নির্মল বাধা দিল ওদের। উলিয়ানের আশেপাশের গ্রামবাসীদের ওপর অত্যাচার ও মেনে নিতে পারল না। মারের বদলে মার, জুলুমের বদলে জুলুম। নির্মলের পেছনে এসে দাঁড়াল সবাই। নির্মল অত্যাচারীদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াল।

১৯৭৬ সালের ঘটনা। একদিন বাড়ী থেকে বেরুবার মুখে খবর পেল নির্মল। ওদের দলের একজনকে উত্তরবিহারীরা কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে কদমার টিসকোর কোয়ার্টার এলাকায়। ওকে ছাড়াবার জন্য নির্মল একাই ছুটে গেল সেখানে। কিছুক্ষন পরে উলিয়ানের ছেলেরা খবর পেল কদমার পঞ্চাশ ষাটজন উত্তরবিহারী ঘিরে রেখেছে নির্মলকে মারধোর করছে ওরা ওকে। উলিয়ান থেকে সুনীল, সুধীর, চিন্ময়রা পঞ্চাশ ষাটজন ছেলে ছুটল নির্মলকে বাঁচাতে। কদমার কোয়ার্টার এলাকায় যখন ওরা পৌঁছাল তখন নির্মল ওদের বলল, "কিছু হয়নি সব মিটে গেছে, চল বাড়ী যাই।" কিন্তু ভিড়ের মাঝে দুপক্ষের কিছুটা বচসা হোল, উত্তপ্ত হয়ে পড়ল দুপক্ষই। নির্মল দুপক্ষকেই থামাতে চেষ্টা করছিল। উলিয়ানের ছেলেরা একসময় দেখল উত্তর বিহারীরা সবাই পালাচ্ছে। বাবুলাল, সুনীল, সুধীর, চিন্ময়রা দেখল মাটিতে পড়ে আছে নির্মল।

ধীরে ধীরে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল নির্মল। চিন্ময় ওকে জড়িয়ে ধরল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে গোটা শরীর। ধীরে ধীরে সাইকেলে উঠল নির্মল। তারপরই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। ওরা ওকে নিয়ে এল, টাটা মেইন হসপিটালে ভর্তি করল। দিন সাতেক সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিল নির্মল। তরোয়াল আর টাঙ্গির আঠারোটা আঘাত ছিল নির্মলের শরীরে। গায়ে শাল জড়ানো ছিল বলে তরোয়াল আর টাঙ্গির কোপ থেকে কিছুটা বেঁচে গেছল নির্মল। সবাই ভেবেছিল বাঁচবেনা নির্মল কিন্তু সে যাত্রা বেচে গেল ও। মাসখানেক হাসপাতালে থাকার পর বাড়ী ফিরে এল নির্মল। বাবা জগবন্ধু মাহাত, মা প্রিয়া মাহাত, দিদি শান্তি, বন্ধু ভাই সুনীল, চিন্ময় বাবুলালদের মন থেকে দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে গেল।

নির্মল সেযাত্রা বিপদ থেকে বেঁচে গেল কিন্তু হাসপাতাল থেকে ফিরে এল অন্য এক নির্মল হয়ে। সুনীলকে বলেছিল নির্মল, নির্মল বলেছিল, ওরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখল, অনেক বড় ভুল করল ওরা। নির্মল তখন সবে ঝাড়খণ্ড পার্টিতে যোগ দিয়েছে। ছেলেরা ঝাড়খণ্ড পার্টির কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ওদের মধ্যে টি.আর.মাঝি ইত্যাদি বলেছিল জামশেদপুরের গুন্ডারাজের বিরুদ্ধে লড়াই করার মত ক্ষমতা ওদের নেই। কিন্তু নির্মলের ঐ একটা কথার মধ্যে অনেককিছু লুকিয়েছিল। নির্মল বলেছিল, "ওরা আমাকে বাঁচিয়ে রেখে বড় ভুল করল।" এই ভুলের মাশুল দিতে হবে ওদের। এরপরই উলিয়ান কদমার গুণ্ডারাজের, সমাজবিরোধী রাজত্বের শেষ প্রহরের ঘন্টা বেজে ওঠে। অনকগুলি হত্যার মামলায় জড়ানো হয় নির্মলকে। জামশেদপুর কোর্ট নির্মলকে সিংভূম জেলার বাইরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে উলিয়ান ছেড়ে সুবর্ণরেখা আর খড়কাই এর মিলনস্থল দোমহনী পেরিয়ে গ্রামের দিকে চলে যায় নির্মল। যাওয়ার সময় সুনীলকে বলে গেছল নির্মল, "পুলিশ যদি বাড়ীর লোকদের উপর অত্যাচার করে জমিজমা ঘরবাড়ী ক্রোক করতে চায় খবর দিও আমাকে। আমি এসে ধরা দিব পুলিশের হাতে।

দিনে রাতে যখন তখন পুলিশ হানা দিত নির্মলের বাড়ীতে। বাড়ীর লোকেদের

হয়রানি করত নানাভাবে। বাবা জগবন্ধু মাহাত, মা প্রিয়া মাহাত, দিদি শান্তি, ভাইয়েরা বন্ধু-বান্ধবেরা সবাই চোখের জল ফেলত। কলেজ থেকে বেরিয়েই টিসকো থেকে সিকিউরিটি অফিসারের চাকরির অফার পেয়েছিল নির্মল। যে চাকরির জন্য নিজেকে এতদিন তৈরী করছিল ও সেই চাকরির মায়া তাকে আর বাঁধতে পারল না। চাকরি করার বাসনা অনেক দিন থেকেই পুষেছিল মনে। ভেবেছিল চাকরি করে সংসারের হাল ধরবে ভাইদের মানুষ করবে। কিন্তু নির্মল হয়ে গেল অন্য মানুষ। নিজের চাকরি নয় ঝাড়খণ্ডের লক্ষ লক্ষ বেকারকে বেঁচে থাকার অধিকার ছিনিয়ে নেবার পথ করে দিতে হবে তাকে। নিজের পরিবারের জন্য নয়, ছোটনাগপুরের লক্ষ লক্ষ পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে হবে তাকে। লক্ষ লক্ষ জংলি, জানোয়ার, গাঁওয়ারদের মাথা উচু করে দাঁড়াতে শেখাতে হবে তাকে। চাকরি করে নিজের পরিবারকে দেখার সময় কই তার।

পায়ে পায়ে পথ চলা

জীবনের পথে বিপ্লবের পথে, পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোন পথ নেই। পথ চলতে চলতেই খুঁজে নিতে হবে সঠিক পথ। পথে না নামলে সেপথের হদিশ পাওয়া যাবে কি করে। নির্মল এতদিন উলিয়ানকে, কদমাকে, সোনারীকে দিয়ে গ্রামের মানচিত্র আঁকত। সুবর্ণরেখা আর খড়কাই এর দোমহনীতে এসে এসে তাকিয়ে থাকত। ওপারের গ্রামগুলির দিকে। ও যেদিন কাঁধে ঝোলা নিয়ে দোমহনীর জলে পা ডুবিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের পথে পা বাড়াল সেদিন থেকেই ওর সত্যিকারের গ্রাম দেখা শুরু হোল। গ্রাম, সিংভূমের গ্রাম, ছোটনাগপুরের গ্রাম, ঝাড়খণ্ডের গ্রাম।

স্কুল নেই, কলেজ নেই, হাসপাতাল নেই, রাস্তা নেই, ঘাট নেই, গ্রামের মানুষের পেটে ভাত নেই তবু আতিথেয়তার ত্রুটি নেই। ওকে ওরা আদর করে বসায়। খাবার দেয়, রাতে শোয়ার জায়গা দেয়। ওর মুখ থেকে কথা শুনে আগ্রহ ভরে, নতুন নতুন কথা। প্রতিবাদ করার কথা আন্দোলনের কথা। এতদিন ওদের এই অবস্থাকে ওরা ভবিতব্য বলে মেনে নিয়ে ছিল। নির্মলের কথায় ওদের মনে আশা জাগে। দেরীতে হলেও ওরা বোঝে, বুঝতে চেষ্টা করে। রাঁচীতে সেই সময় ঝাড়খণ্ড ছাত্র সংঘ তৈরী হয়েছে। তাদের নেতা প্রফুল্ল মাহাতো, বিষ্ণুপদ সোরেনরা সুবর্ণরেখা জলাধার প্রকল্পের বিরুদ্ধে সভা সমিতির করে। নির্মল তাতেও যোগ দেয়। ঘনশ্যাম বাবুরা বিরোধিতা করে। সাংস্কৃতিক পূণর্জাগরণের জন্য নির্মল কথা বলে, ডঃ ধীরেন সাহা ও পশুপতি প্রসাদ মাহাতোদের সঙ্গে।

নির্মল যে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে পুলিশ এটা জানতে পেরেছিল। তাই বাড়ীতে আর যখন তখন হানা দেন না ওরা। বাড়ীর লোককে আর হয়রান হতে হয় না। এই সময় ফরওয়ার্ড ব্লকের ঘনশ্যাম মাহাতোর নামে বিভিন্ন আন্দোলনের জন্য বডি

ওয়ারেন্ট হয়। ফেরার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ঘনশ্যাম। নির্মলের সঙ্গে যোগযোগ হয় ঘুরতে ঘুরতে। এর পর থেকে নির্মল আর ঘনশ্যাম একসঙ্গে ঘোরাফেরা শুরু করে। ঘনশ্যাম এর সঙ্গে চান্ডিলের বিভিন্ন গ্রাম থেকে শুরু করে পুরুলিয়ার দিকে চলে আসে। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়, আড়ষা, সিরকাবাদ, বাঘমুণ্ডি, বেগুনকোদর, ঝালদার গ্রামে গ্রামে ঘুরতে থাকে ওরা। বিধান সভার নির্বাচনের সময় আবার চলে আসে চাণ্ডিল।

ঘনশ্যামের হয়ে চাণ্ডিলের গ্রামে গ্রামে প্রচার চালাল নির্মল সুবর্ণরেখা পরিকল্পনার বিরুদ্ধে, ঘনশ্যাম ভোটে জিতে পাটনা চলে গেল। নির্মল ঘুরতে থাকল গ্রামে। নির্মল মাঝে বাড়ী আসত, জামশেদপুর কোর্টে মামলা মোকদ্দমাগুলির তদারক করত আবার চলে যেত গ্রামের দিকে। উলিয়ানের লোকেরা ওর গতিবিধির খবর আর রাখতে পারত না। ঘনশ্যাম ওকে ফরওয়ার্ড ব্লকে নিয়ে যাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিল। ঘনশ্যামের হয়ে নির্মল প্রচারেও নেমেছিল কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লকে ও যায়নি। ঘনশ্যাম নির্মলের মামলা মোকদ্দমাগুলির নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা করবে বলে কথা দিয়েছিল এজন্য নিয়মিত যোগাযোগও রাখত কিন্তু নির্মলের এক কথা, রাজনীতি করতে হলে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনই করবে ও। ঘনশ্যামের ব্যাক্তিগত ব্যবহার ও চাণ্ডিলবাসীদের দেওয়া স্তোকবাক্য যখন মিলল না, সুবর্ণরেখা নদীবাঁধ প্রকল্প যখন চালু হয়ে গেল, নির্মল ঘনশ্যামের থেকে দূরে সরে গেল। এদিকে ৮ ই ডিসেম্বর ১৯৮০ গুয়াতে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার আন্দোলনে আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ গুলি চালায়। অনেক লোক হতাহত হয়।নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে শৈলেন্দ্র মাহাতো ছিলেন অন্যতম। শৈলেন্দ্রকে পুলিশ খুঁজতে থাকে। শৈলেন্দ্র ফেরার হয়। শৈলেন্দ্রর সঙ্গে যোগাযোগ হয় নির্মলের। নির্মল শৈলেন্দ্রকে আশ্রয় দেয় বাড়ীতে। শৈলেন্দ্র গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে খুব একটা মিশত না। মিশলেও রাজনীতি নিয়ে কোন আলোচনা করত না। রাতের দিকে নির্মল বাড়ী এলে দুজনে আলোচনা করত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। ১১ ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ টিসকোর দশ হাজার ঠিকাদার মজদুর সি,পি,আই এর নেতৃত্ব হরতালের ডাক দেয়, ঝাড়খণ্ড পার্টি এবং সেই সঙ্গে নির্মলও তা সমর্থন করে। পরবর্তীকালে ঝাড়খণ্ড পার্টি সমর্থন তুলে নিলেও নির্মল সমর্থন করে শ্রমিকের দাবী। ঝাড়খন্ড পার্টির সঙ্গে এভাবেই সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায় নির্মলের।

নির্মল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চায় যোগদান করে। সেই সময় কৃষ্ণা মাণ্ডির মত নেতা, পোটকা বিধানসভা ক্ষেত্রের কয়েক হাজার সি. পি. আই এর কর্মী সহ লক্ষ্মী কুণ্ডু ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চায় যোগদান করে। ১৯৮১ সালের ১৮ ই জুলাই ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সিংভূম জেলা সম্মেলনে নির্মলকে সিংভূম জেলার সহ-সভাপতি করা হয়। ধীরে ধীরে নির্মলের রাজনৈতিক পরিচিতি বাড়তে থাকে। ১৯৭২ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত নির্মল ঝাড়খণ্ড পার্টির কর্মী হিসেবে গ্রামে গ্রামে সংগঠন তৈরী করছিল। ১৯৮০ সালে ১৫ই ডিসেম্বর ও ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চায় যোগদান করে।

ধানবাদের ১৯৮২ সালে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার দশম মহাধিবেশনে নির্মল মাহাত কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য মনোনীত হয়। নির্মলের ব্যক্তিত্ব সকলকে মুগ্ধ করে। ওর কর্মতৎপরতা এবং সাংগঠনিক ক্ষমতায় চমকিত হন সকলে। ১৯৮৪ সালে পার্টিবিরোধী ক্রিয়াকলাপের অভিযোগে বিনোদ বিহারী মাহাতকে সরিয়ে নির্মলকে ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চার সভাপতি করা হয়। বিনোদবিহারী মাহাতোর বিরাট ব্যক্তিত্বের শূন্যস্থানটা নির্মল ভরিয়ে দিতে পারবে কিনা সে সম্বন্ধে অনেকের মনেই সংশয় ছিল। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নির্মল তার সাংগঠনিক শক্তির প্রমান দিল। ১৯৮৬ সালের মহাধিবেশনে নির্মল মাহাত এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি। নির্মলের কর্মতৎপরতা মোর্চার অন্যান্য কর্মকর্তাদের ম্লান করে দিল। নির্মল পুনরায় ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সভাপতি মনোনীত হন। সম্পাদক থেকে যান দিশমগুরু শিবু সোরেন।

বানসা-বুলানডির কাহিনী

কান্ড্রা থেকে চৌকা রাস্তায় জামশেদপুর থেকে প্রায় ৩৫ কিমি দূরে বানসা-বুলানডি গ্রাম। নির্মলের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকের ঘটনা। নির্মল সুনীলকে নিয়ে বানসা-বুলানডিতে গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে। সরল গ্রামবাসীরা ওদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার পরে গ্রামবাসীরা বলে, 'আমরা অতশত বুঝি না, নেতারা যে যা বলে আমরা তাই শুনি কিন্তু নেতারা ভোটে জেতার পর আমাদের কথা শোনে না। আমাদের কোন কাজ হয় না। এখন ধরুন এই কান্ড্রা থেকে চৌকা রোড চলে গেছে আমাদের ধানক্ষেতের উপর দিয়ে। সরকারি রাস্তা হবে আমাদের যাতায়াতের সুবিধা হবে, তাই আমরা বাধা দিইনি। আমাদের ধানের জমি নষ্ট হয়ে গেল। ওরা বলেছিল ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়া যাবে। আমরা আজ পাব কাল পাব করে অপেক্ষায় আছি কিন্তু আঠারোটা বছর পেরিয়ে গেল সেই টাকা আমরা পেলাম না। পার্টির নেতাদের দেখা পেলে আমরা বলি। ওরা আসেন ভোটের সময় তখন ওরা বলেন ভোটটা দাও টাকা পেয়ে যাবে। কিন্তু ভোট পেরোলে নেতাও আসেন না টাকাও আমরা পাই না। আপনাকে আমরা ভোট দেইনি। আপনি যদি বলেন ভোট দাও তারপরে হবে তাহলে আমরা বুঝে নেব আপনিও আমাদের টাকা আদায় করে দিতে পারবেন না।"

নির্মল বলল 'আমি তো আপনাদের কাছে ভোট চাইতে আসিনি, আমি এসেছিলাম আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আপনাদের কাজ করার জন্য, ঠিক আছে রাস্তায় নষ্ট হয়ে যাওয়া জমির ক্ষতিপুরন তোমরা পাও কি না আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। বানসা থেকে ফিরে এসে জামশেদপুরে মাইনিং ডিপার্টমেন্টের অফিসে তিন চারদিন গেল নির্মল। বানসার চাষীদের জমির ক্ষতিপূরনের টাকার খোঁজ খবর নিল কিন্তু অফিসাররা কোন আমলই দিল না। দেখেশুনে ফিরে এল নির্মল বানসায়। বানসার লোকদের আবার ডাকল ও। অফিসারদের আচরণের কথা বলল। বলল ওরা কোন পাত্তাই

দিচ্ছে না। গ্রামবাসীরা হতাশ হোল বলল, "তাহলে তো টাকা পাওয়া যাবে না। নির্মল বলল পাওয়া যাবে। অফিসারদের এখানে ডেকে নিয়ে আসতে হবে। এখানে এসে যাতে ওরা আমাদের ক্ষতিপুরণের টাকা দিয়ে যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।"

গাঁয়ের লোকেরা বলল তা কি করে হয়। নির্মল বলল, 'হয়, এছাড়া আমাদের অন্য কোন পথ নেই। পাকা রাস্তা তোমরা মাঝখানে কেটে দাও, যাতে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ আসুক মিলিটারী আসুক ভয় কর না তোমরা।' গ্রামবাসীরা নির্মলের কথা শুনল। পাকা রাস্তা ওরা কেটে দিল। গাড়ীঘোড়া চলাচল বন্ধ হয়ে গেল কান্দ্রা-চৌকা রোডে। সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল ডি.সি. এস.পি'র কাছে। একে একে সমস্ত বাঘা বাঘা অফিসাররা ছুটে এল বানসা-বুলানডি গ্রামে, এতদিন যাদের দর্শন পাওয়া যায়নি তারা সবাই এসে বানসা-বুলানডির চাষিদের সাধাসাধি করতে লাগল রাস্তা মেরামত করতে দেওযার জন্য। চাষিরা বলল— আমরা কোন কথা শুনবো না যতক্ষণ না আমরা ক্ষতিপূরণের টাকা পাচ্ছি। আঠারো বছর আমরা অপেক্ষা করেছি, আর না। নির্মল বলল, আঠারো বছরের ফসলের দামও ওদের দিতে হবে। অফিসাররা গ্রামে এসে ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে গেল, রাস্তা আবার চালু হোল। জিত হোল নির্মলের গ্রামবাসীরা নির্মলের ভক্ত হয়ে পড়ল।

এই জয়ের পরেই নির্মল ওখানে মিটিং ডাকল। সেদিনও সঙ্গে ছিল সুনীল। একটা জীপ ভাড়া করেছিল ওরা। গ্রামের সবাই এসেছিল সেদিন মিটিং এ। মুখিয়া সাহেবও সেদিন খুব খুশি ছিলেন। মাইকের সামনে এসে অনেকেই বক্তব্য রাখছিল, এমন সময় ৭-৮ টি মেয়ে এসে জিজ্ঞেস করল নির্মল মাহাত কার নাম। লোকেরা দেখিয়ে দিল নির্মলকে। ওরা কারও কাছে শুনেছিল নির্মলের নাম, কেউ ওদের বলেছিল নির্মলের কথা, ওরা তাই ছুটে এসেছে ওর কাছে। ওরা বলল, ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের সাহেব এসেছে লোকজন নিয়ে। গ্রামে এসে ওরা বাড়ি বাড়ি ঢুকে বনের কাঠ দেখছে। কেউ কেউ হাল বানাতে জঙ্গলের কাঠ এনেছিল। তাদের বাড়ি থেকে ওরা হাঁস, মুরগী, ছাগল ইত্যাদি নিয়ে গেছে, চাল নিয়ে গেছে অনেক। আবার সেই সঙ্গে তিনজনকে ধরেও নিয়ে গেছে অফিসে। ওরা প্রায়ই এরকম করে। আমরা আমাদের প্রয়োজনের জন্য দু-একটি কাঠ কাটি কিন্তু ফরেষ্টাররা আমাদের ওপর এরকম জুলুম করে প্রায়ই। এর কিছু একটা ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতেই হবে। ফরেষ্ট অফিস কাছেই নির্মল ওদের বলল, 'তোমরা গিয়ে বল ফরেষ্টের বড় অফিসারকে, গ্রামে মিটিং হচ্ছে, নির্মল মাহাত তোমাদেরকে যেতে বললেন মিটিং এর ওখানে। 'মেয়েরা চলে গেল। নির্মল জানত মেয়েদের কথায় নির্মলের ডাকে ফরেষ্টের বড় অফিসার আসবে না। কিন্তু মেয়েগুলোকে তবু পাঠাল।

ওর চোখের সামনে ভাসছিল ঝাড়খন্ডের জঙ্গলের মানচিত্রটা। জঙ্গল আদিবাসীদের কাছে মায়ের মত। জল ছাড়া মাছ যেমন বাঁচতে পারে না, আদিবাসীরা জঙ্গল ছাড়া বাঁচতে পারে না। আদিবাসী অর্থনীতির সঙ্গে জঙ্গল অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত।

জঙ্গলের ফল, মুল, শেকড় বাকড় খেয়ে এরা খাবারের ঘাটতি অনেকখানি পুষিয়ে নেয়। যুগ-যুগান্ত থেকে এরা জঙ্গলকে ব্যবহার করে আসছে। কৃষি সরঞ্জাম, জ্বালানী, ঝুড়ি-ঝাঁটা, শালপাতা, ঘোঙপাতা, চিহড়লতা দিয়ে এরা, খালা, পতরি, ঘোঙ ইত্যাদি বানিয়ে বাজারে বিক্রি করে কিছু আয় উপায় করার চেষ্টা করে। এতদিন এরা জঙ্গল ব্যবহার করে আসছে কিন্তু জঙ্গল শেষ হয়ে যায়নি কিন্তু যখন থেকে জঙ্গল সরকারি সম্পত্তি হয়ে গেল, জঙ্গল রক্ষীরা, জঙ্গল রক্ষা করতে এসে শেষ করে দিল জঙ্গলকে। শাল, মহুলের প্রয়োজনীয় জঙ্গল উচ্ছেদ করে এরা বিদেশী গাছ ইউক্যালিপটাসের গাছ লাগাতে শুরু করল। যা থেকে আদিবাসীরা ফল, পাতা কিছুই পায় না, পায় না রোদ বাঁচানোর ছায়া। এখন আবার নতুন করে শুরু হয়েছে জুলুম, জঙ্গলের কাঠ কেটেছে এই অছিলায় গেঁয়ো লোকদের ভয় দেখিয়ে জরিমানা, হাঁস, মুরগী, খাসি, চাল, ডাল ইত্যাদি আদায় করা।

মেয়েরা কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল এবং নির্মল যা ভেবেছিল তাই বলল, "ফরেষ্ট অফিসার বলেছেন, কে নির্মল মাহাত আমরা জানি না। ওর কথায় আমরা কেন যাব! জীপ নিয়ে নির্মল ছুটল ফরেষ্ট বাংলোয়, অফিসারকে ডেকে বলল, "আপনারা গ্রামের লোকদের কাছ থেকে চাল, ডাল, হাঁস, মুরগী, খাসী নিয়ে এসেছেন কেন? অফিসার বললেন, 'ওরা জঙ্গলের কাঠ কেটেছে তাই ওদের জরিমানা নেওয়া হয়েছে। নির্মল বলল, 'তাহলে চলুন গ্রামের লোকেদের মিটিং চলছে ওখানে গিয়ে সকলের সামনে একথা বলুন।"

ফরেষ্ট অফিসার এলেন, না এসে ওর উপায় ছিল না, নির্মলের রুদ্র মূর্তি দেখে উনি বুঝেছিলেন যেতেই হবে তাকে। নির্মল ওকে জিপে তুলে নিয়ে এলেন গ্রামবাসীদের মিটিং এর মাঝখানে। শুরু হল ফরেষ্ট অফিসারের গণবিচার। নির্মল ওকে জেরা করছিল সকলের সামনে, আপনি সকলের সামনে বলুন আপনি এদের বাড়ি থেকে জোর করে চাল, ডাল, হাঁস, মুরগী, খাসি, নিয়ে গেছেন? অফিসার বললেন, হ্যাঁ। কেন নিয়েছেন। অফিসার বললেন, জঙ্গলের কাঠ কেটেছে ওরা লাঙ্গল বানানোর জন্য সেজন্য জরিমানা নিয়েছি। তারজন্য কোন রসিদ দিয়েছেন ওদের? অফিসার বললেন, না। নির্মল বলল কেন দেননি? অফিসার চুপ করে রইলেন। গ্রামবাসীদের একজনের কাছ থেকে একটা লাঠি নিয়ে নির্মল মার লাগাল প্রচন্ড মার। অফিসার এটা ভাবতে পারেন নি। নির্মল বলল, চলুন আপনি থানায়, দারোগাকে বলবেন আমি আপনাকে মেরেছি। আমার নামে মামলা করবেন। অফিসার কোন কথা বললেন না। অফিসার থানায় এলেন না। চলে এলেন বাংলোয়। নির্মল সুনীলকে নিয়ে থানায় এল। দারোগাকে বলল সব ঘটনা, দারোগা ফরেষ্ট অফিসারদের জুলুমের কথা শুনে নির্মলকেই সমর্থন করলেন।

জীপে আসার সময় সুনীল বলছিল নির্মলকে, "নির্মল অতবড় একজন অফিসারকে এভাবে মারা তোমার ঠিক হোল না।" আসলে সুনীল নির্মলের দুঃসাহসে

ভয় পেয়ে গেছিল। মামলা মোকদ্দমা করতে পারে ওরা। নির্মল তখন বলেছিল, ঠিক করেছি ঐরকম অফিসারদের এমনিভাবে গ্রামের লোকেদের সামনে মারতে হবে। যাতে ওরা বুঝতে পারবে, এই বড় অফিসাররাও মানুষ, বাঘ-ভালুক নয়। তা নাহলে খাঁকি পোষাক দেখলেই গ্রামের লোক ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। জুলুম করার সাহসটা এদের বেড়ে যায়। অসাধু অফিসারদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে জুলুমের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের রুখে দাঁড়াবার সাহস এমনি ভাবেই তৈরী হবে।

তারপর থেকে বানসা-বুলানডি এলাকায় ফরেষ্ট অফিসারদের জুলুম আর হয় নি। সেই ফরেষ্ট অফিসার থানায় আসেননি নির্মলের নামে মামলা করতে। নির্মলের কাছে চরমভাবে অপমানিত হয়ে তিনি আর এমুখো হননি। গ্রামবাসীদের কাছে নির্মলের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে, ছড়িয়ে পড়তে থাকে নির্মলের নাম লোকের মুখে মুখে।

মুখিয়ারাজ না মাফিয়ারাজ

সুসেন মাহাত তখন হলুদপুকুরে মেডিকেল স্টোরে ফার্মাসিস্ট হিসেবে কাজ করত। ১৯৮২ সাল থেকে নির্মলের ওদিকে যাতায়াত শুরু হয়। তখন নির্মলের কোন গাড়িঘোড়া ছিল না। বাসে যেত নির্মল। সুসেনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর থেকে সুসেন নির্মলের কথাবার্তা এবং কাজকর্মে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। হলুদ-পুকুরে বাসে নেমে সুসেনের মোটর সাইকেলে ওরা দুজনে পোটকা ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে যেত। রাত হলে ওদিকেই সুসেনের বাড়িতে থেকে যেত নির্মল। নির্মলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে সুসেন। ফার্মাসিস্টের কাজে সময় না দিয়ে রাজনীতির কাজে বেশি সময় দিতে একসময় কাজ ছেড়ে দেয় সুসেন।

পোটকা ব্লকের নারদা পঞ্চায়েতের মুখিয়া ছিলেন গদাধর সিট। এরকম প্রতাপশালী মুখিয়া সাধারণতঃ দেখা যায় না এখন। মুখিয়া সাহেবের চিফ্ অফিসার ছিলেন মতিলাল তাঁতি। মুখিয়ার যোগ্য সহকর্মী। বেগনা, বকমডি, কাশিডি, পিটিদিরি, ছাতনা; লেদকচা, পাহাড়পুর, কুঁদরুকচা, সিঁদুরপুর, কাশিয়াগড়া ইত্যাদি গ্রামগুলি নারদা পঞ্চায়েতের অধীনে। জামশেদপুর থেকে প্রায় ৫০ কি.মি. দক্ষিণে উড়িষ্যা সীমান্তে কুঁদরুকচা গোল্ড মাইন এই পঞ্চায়েতেরই অধীন।

প্রায় প্রতি মাসে দশ বারোটি জরিমানা থেকে মুখিয়া গদাধর সিট এবং চিফ্ অফিসার মতিলাল তাঁতির মাসিক আয় ছিল কম করেও দশ হাজার টাকা। নারদা পঞ্চায়েতের অধীন গ্রামগুলির ভূমিজ, সাঁওতাল, খাড়িয়া, কুড়মি, ধোবিরা মুখিয়া গদাধর সীট এবং চিফ্ অফিসার মতিলাল তাঁতিকে তাদের দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা হিসেবে জানত।

চিফ্ অফিসার মতিলাল তাঁতির কাজ ছিল যে কোন অছিলায় প্রতিমাসে কম করে দশজন লোককে মুখিয়ার অফিসে ধরে আনা। মুখিয়ার কাজ ছিল লোকটিকে

গাছের সঙ্গে বেঁধে মারতে মারতে কিংবা শীতকালে কন্‌কনে ঠান্ডাজলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে তাকে দোষ স্বীকার করানো এবং পাঁচশ থেকে এক হাজার টাকা জরিমানা কবুল করানো। এ ব্যপারে নির্যাতনের নানারকম নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করায় মতিলাল তাঁতির জুড়ি ছিল না। গ্রামবাসীরা শেষ পর্যন্ত জরিমানা কবুল করতে বাধ্য হোত এবং জমিজমা বিক্রি করে জরিমানার টাকা দিতেও তারা বাধ্য ছিল কারণ জরিমানার টাকা না দিতে পারলে নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যেত।

এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা প্রতিকারের যে কোন পন্থা আছে গ্রামবাসীরা তা ভাবতে পারত না। তারা ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছিল। সুসেনের মারফৎ নির্মল খবর পেয়ে ছুটল সেখানে। গ্রামবাসীদের সংগঠিত করার জন্য। ১৯৮৩ সালের ২২শে জুন বেগনাডি, বকমডি, কাশিডি, পিটিদিরি নারদার লোকেরা দেখল এক অভাবিত ঘটনা। নির্মল মাহাত সুসেন মাহাতর নেতৃত্বে দশহাজার লোকের একটা সশস্ত্র মিছিল ঢুকছে নারদা পঞ্চায়েতে। যে পঞ্চায়েত অফিসে এতদিন মুখিয়া গদাধর সিট এবং তার চিফ্ অফিসার মতিলাল তাঁতি গ্রামবাসীদের ন্যায় বিচার চালিয়ে এসেছেন দৌর্দণ্ডপ্রতাপে সেই পঞ্চায়েত অফিসে গদাধর সীট এবং মতিলাল তাঁতিকে দাঁড়াতে হোল আসামীর কাঠগড়ায়।

বিচার চলল গণ আদালতে। জনগণের রায়ে দোষী সাব্যস্ত হলেন গদাধর সিট এবং মতিলাল তাঁতি। নির্মল মাহাত হুকুম করলেন গ্রামবাসীদের জরিমানার টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। এ পর্যন্ত জরিমানা থেকে মুখিয়ার আয় হয়েছিল লক্ষাধিক টাকা। সবটা নাহলেও হাজার বিশেক টাকা মুখিয়া ফেরৎ দিলেন গ্রামবাসীদের। গাঁয়ের লোকেরা তাতেই খুশী। টাকা পেয়ে তাদের যতটা না আনন্দ মুখিয়ারাজের জুলুম শেষ হওয়ার জন্য তাদের আনন্দ আর ধরে না। গণ আদালতের বিচারে সেদিন উপস্থিত ছিলেন পোটকা ব্লকের বি.ডি.ও ব্যানার্জী সাহেব। তিনিও নির্মলকে অভিনন্দন জানালেন। বন্ধ হোল মুখিয়া গদাধর সিটের অত্যাচার, গ্রামবাসীরা দুহাত তুলে আশীর্বাদ করলেন নির্মলকে।

গণ আদালেতের বিচারে গদাধর সিটের কৃতকার্যের জন্য অপমানিত হয়ে কোমর ভেঙে গেল। জুলুম থেকে মুক্ত হোল নারা পঞ্চায়েত। নির্মলের নাম ফিরতে লাগল লোকের মুখে মুখে। বেগনাডি, বকমডি, কাশিডি, পিটিদিরি, ছাতনা, লেদকচা পাহাড় কুঁদরুকচা, সিঁদুর পুর, কাশিয়াগড়ার জনসাধারনের কাছে নির্মল হয়ে গেল সাক্ষাৎ ভগবান।

বালিডির বিরসা ড্যাম

ছোটনাগপুর বা ঝাড়খণ্ড এলাকার কৃষিনির্ভর অর্থনীতির মূল সমস্যা সেচের জল। এখানকার কৃষকেরা ধানরোয়ার সময় আষাঢ়-শ্রাবণ এবং ধানকাটার সময় কার্তিক-অগ্রহায়ণ চাষের কাজ করে। বৎসরের বাকি সময়টা বেকার। এক ফসলা

বৃষ্টি নির্ভর জমিতে অনিশ্চয়তার ফসল কোন বছর ঘরে আসে, কোন বছর আসেনা। সুতরাং ঋণের জালে জড়িয়ে জড়িয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে চাষী। মজুর হিসেবে চলে যায় খনি আর শিল্পাঞ্চল গুলিতে, আসামের চা-বাগানে আর গাঁঙ্গেয় উপত্যাকায় সমতল ভূমিতে নামাল খাটতে। এদের উন্নতি ঘটাতে হলে একফসলী বৃষ্টি নির্ভর জমিকে অনিশ্চয়তার হাত থেকে বাঁচাতে হবে। একফসলী জমিকে দো-ফসলী, তিন-ফসলী করতে হবে। এর জন্য চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা।

সরকারী তরফ থেকে এরজন্য সমবেদনাও জানান হয় কখনও কখনও। বড় বড় ড্যাম গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে এই বড় বড় নদী বাঁধগুলির পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যায় সমতলভূমির বন্যারোধ করার জন্য, ছোটনাগপুরের চাষীদের সেচের জল সরবরাহ করার জন্য নয়। ড্যামগুলিতে যত হাজার একর জমি জলের তলায় যায় তত হাজার একর জমিতে সেচের জল পায় না। যত হাজার লোক নদীবাঁধ পরিকল্পনায় উৎখাত হয় তত হাজার লোক সেচের জলে চাষ করতে পায় না। এরকম সেচ প্রকল্পের কোন প্রয়োজন নেই ছোট নাগপুরে। বিকাশের নামে বিনাশের এই ষড়যন্ত্র।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা সরকারের মিলিত প্রয়াসে এবং ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রস্তাবিত সুবর্ণরেখা জলাধার পরিকল্পনায় চাণ্ডিল বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় অর্ধেক অংশ জলে ডুবে যাবে। কোয়েলকারো জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনায় ডুবে যাবে একশত গ্রাম এবং এই গ্রামগুলির বাসিন্দা প্রায় পনের হাজার পরিবারের কমপক্ষে লক্ষাধিক মানুষ উদ্বাস্ত হবে। কংসাবতী, পাঞ্চেৎ, মাইথন, তিলাইয়া, দুর্গাপুর ব্যারেজ, হীরাকুঁদ ইত্যাদি জলাধারগুলির পরিকল্পনা অনুযায়ী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের খেসারত দিতে হয়েছে ঝাড়খণ্ডের মানুষকে। এগুলিতে প্রায় দশলক্ষ আদিবাসী কৃষককে সর্বস্ব হারাতে হয়েছে, জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য সুবর্ণরেখা পরিকল্পনা থেকেও বিদ্যুৎ আসবে।

১৯৪৭ সালের ২২ শে ডিসেঃ তখনকার গণ পরিষদে বা কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লিতে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বিল উত্থাপন করেত গিয়ে তৎকালীন খনি ও বিদ্যুৎমন্ত্রী এন.ভি. গ্যাডগিল বলেছিলেন এই প্রকল্প রূপায়িত হলে, 'এ ভ্যালি অফ্ ডেথ এণ্ড ডেস্ট্রাকশন' রূপান্তরিত হবে, 'এ ভ্যালি অফ্ এমপ্যারিটি এ্যাণ্ড হ্যাপিনেস এ।" আঃ বাঃ ৩১-৫-৮৩ প্রতিবেদক-গৌতম গুপ্ত আমেরিকার টেনিসি ভ্যালি অথরিটি থেকে আনা হয়েছিল বিশেষজ্ঞদের। কিন্তু ডি. ভি. সি. হাজারীবাগ, গিরিডি, ধানবাদ ও পুরুলিয়ার চাষীদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ডি.ভি.সি পরিনত হয়েছে এক মাফিয়াচক্রে।

কংসাবতী জলাধার পরিকল্পনায় পুরুলিয়ার ৭৭টি গ্রাম আংশিক বা পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুরুলিয়া জেলার আর. এল. ৪৮০ উচ্চতা অথার্ৎ সমুদ্র তলদেশ

থেকে যে উচুমাটির সমতল ক্ষেত্র সবচাইতে বেশী উর্বর তার মধ্যে ঐ দুটি বৃহৎ পরিকল্পনার জন্য ৪৫০০০ একর অতি উৎকৃষ্ট চাষযোগ্য জমি জলের তলায় চলে গেছে।

কোয়েল-কারো জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে দুটি জলাধার তৈরী হবে। একটি রাঁচী জেলার পশ্চিমাংশে কোয়েল নদীতে অন্যটি কারো নদীর উত্তরাংশে। এই পরিকল্পনায় খরচ হবে প্রায় ২০০ কোটি টাকা। বিশ্ব ব্যঙ্ক কেন্দ্রিয় সরকারের মারফৎ দেবে এই টাকা। মুণ্ডা, ওঁরাওদের পিতৃ-পিতামহের ভিটামাটি ডুবে যাবে জলের তলায়।

বিকাশের নামে বিনাশের এরকম জঘন্য চক্রান্তের বিরোধীতা করে নির্মল। ছোট ছোট নদীবাঁধ করার পক্ষপাতী যাতে চাষের জমি নষ্ট হবে কম, সেচের জল পাবে অনেক বেশী জমিতে। এরজন্য সঠিক জায়গা বেছে নিতে হবে। জামশেদপুর থেকে চল্লিশ কিঃ মিঃ দক্ষিনে পোটকা ব্লকেরই অধীন আর একটি গ্রাম বালিডি। বালিডির একদিকে ছোট ছোট দুটি ডুংরী ওপাশে উড়িষ্যা ফরেষ্টের ইউক্যালিপ্টাসের জঙ্গল।

বালিডি, রসুনচোপা, বাঘলতা, হেঁসড়া, চারটি গ্রামের বাসিন্দারা হিসেব করে দেখেছে বালিডির ডুংরীদুটোর মাঝখানে যদি বাঁধ দেওয়া যায় তাহলে বালিডি, সেচের জল পাবে বারমাস। একফসলী জমি তিনফসলী হয়ে যাবে। চারটি গ্রামের কম করেও চার হাজার পরিবার দারিদ্রের জালা থেকে রেহাই পাবে। চারটি গ্রামের তিন হাজার একর জমিতে সোনা ফলাবে তারা।

অন্যদিকে বাঁধের জলে ডুববে উড়িষ্যা ফরেস্টের কিছু ইউক্যালিপ্টাস গাছ। লাভের থেকে ক্ষতির পরিমান প্রায় কিছুই না। চাষীদের কথা ভাবলে উড়িষ্যার বনবিভাগের বাঁধ তৈরীর ব্যাপারে কোন রকম বিরোধীতা করার কোন যুক্তিই নেই। গ্রামবাসীরা দরখাস্ত করে বিহার সরকারের সেচবিভাগে বারবার কিন্তু কর্ণপাত করে না কেউ। কারণ সেচ পরিকল্পনার দায়ীত্বে আছেন বাঘা বাঘা ইঞ্জিনীয়ার। তারাই পরিকল্পনা করবেন সেচের, বালিডি, রসুলচোপার,বাঘলতা হেঁসড়ার অকাট মুখখু গেঁয়োদের কাজ করতে হলে তাদের সম্মান থাকবে কোথায়। অবশেষে তারা ঠিক করল নিজেরাই এই বাঁধ তৈরী করবে। শুরু হোল কাজ। ডেমের ওদিকে উড়িষ্যার ইউক্যালিপ্টাস গাছ। আপত্তি করা উচিত নয় কিন্তু উড়িষ্যার বনবিভাগ আপত্তি তোলে বাঁধ তৈরীর কাজে মাটিকাটা চাষিদের বন্ধুকের নল দেখিয়ে হটিয়ে দেয় পুলিশ, বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে চলে যায় তারা। এরকম একবার নয় বার বার উড়িষ্যার বনবিভাগের আপত্তিতে বাঁধ ভেঙে দিয়ে যায় উড়িষ্যা পুলিশ।

লক্ষ্মী কুণ্ডু, শরৎ মাহাতো, সুসেন মাহাতোর মারফৎ খবর পায় নির্মল। সুসেনকে সঙ্গে নিয়ে বালিডিতে ছুটে আসে নির্মল। নির্মলের ডাকে বালিডি, রসুনচোপা, বাঘলতা, হেঁসড়ার প্রতিটি পরিবারের মেয়ে পুরুষ বেরিয়ে আসে, গাঁইতি, কোদাল, শাবল ঝোড়া নিয়ে। শুরু হয় বাঁধ তৈরীর কাজ আবার নতুন উদ্যাম। তিনদিন তিনরাত্রী

রাতদিন কাজ করতে থাকে কয়েক হাজার মেয়ে পুরুষ। পুরুষেরা মাটি কোপায়া ঝুড়িতে তুলে দেয় মেয়েরা মাটিভর্তি ঝুড়ি বয়ে নিয়ে যায় বাঁধের আলে। নির্মল ওদের সঙ্গে পাথর বইতে থাকে রাতদিন, বিশ্রামহীন। তিনদিন তিনরাত্রিতে বাঁধ তৈরীর শতকরা নব্বইভাগ কাজ শেষ হয়ে যায়। এই কদিনের কাজের পরেও কয়েকশ মেয়েপুরুষ তিনমাস ধরে কাজ করে। নির্মলও থেকে যায় ওখানে বাঁধের কাজ সম্পুর্ণ হয়।

কেউ কাউকে মজুরী দিচ্ছেনা কেউ কারও মজুর খাটছে না সবাই কাজ করছে নিজের জন্য সবার জন্য, মাটি কাটার কাজে যে এত আনন্দ এখানকার মানুষেরা আগে তা অনুভব করেনি। নির্মলের কাছেও এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। নির্মল ওদেরকে উৎসাহিত করার জন্য দিনরাত কখনও গাঁইতি পাড়ছে, কোদাল পাড়ছে, ঝোড়া বইছে পাথর বইছে। এ যেন এক মহোৎসব। থেকে থেকে শ্লোগান দিচ্ছে যুবকরা নির্মল মাহাত জিন্দাবাদ। এবার আর উড়িষ্যা পুলিশ আসেনি বাঁধ ভেঙে দিতে। রুক্ষ শ্রীহীন বালিডি, রসুনচোপা, বাঘলতা, হেঁসড়া এখন গোটা বছর শস্য শ্যামল।

এখন ডেমের জলে গোটা বছর ফসল ফলে তাদের জমিতে। গোলা ভরে যায় ধানে। আলু, পেঁয়াজ, গম, কুমড়ো হাজার রকম তরিতরকারীতে ভরে যায় ক্ষেত। গোটা সিংভূমে যখন খরায় মরে যায় ধানের চারা, ধু ধু ধানের ক্ষেতে বালিডি, রসুনচোপা, বাঘলতা, হেঁসড়ার ধানের ক্ষেতে বিরসা ডেমের জল বয়ে যায় কল্ কল্ শব্দে। লক্-লক্ করে বাড়তে থাকে ধানের চারা। তখন কোন গৃহবধুর মনে জেগে ওঠে বিরসা ডেম বাঁধার স্মৃতি। ছেলেরা শ্লোগান দিচ্ছে নির্মল মাহাত জিন্দাবাদ। হাসতে হাসতে পাথর বইছে, কোদাল পাড়ছে, গাঁইতি পাড়ছে, ঝোড়া বইছে নির্মল- নির্মল মাহাত, ঝাড়খণ্ডের যীশু। তিরিং এর এপারে কল্‌কল্ করে বয়ে যাওয়া বিরসা ডেমের জলের উপর কিম্বা, বাতাসে দোল খাওয়া ধানের চারার উপর টপ্‌টপ্ করে ঝরে পড়ে দুফোঁটা চোখের জল। নির্মল আর ফিরে আসবে না ভেবে বালিডি, রসুলচোপার ক্ষেতে হাল বাইতে বাইতে চোখের জলে ঝাপ্সা হয়ে যাওয়া দৃষ্টিতে সামনে কিছু দেখতে না পেয়ে গরু দুটোকে একটু থামিয়ে দিয়ে কাঁধের গামছায় চোখের জল মুছে নেয় কোন চাষী, এর চেয়ে বড় কিছু বেশী কিছু চায়নি নির্মল। নির্মলেরা যেমন করে হাসায় তেমনি করে কাঁদায়, পেছন ফিরে তাকায় না।

কাবুলিওয়ালা এবং ক্ষুদ্র শিল্প

টেলকো, টিসকো, কেবল্, জেমপো, টিনপ্লেট, উইয়ার এর পরেও গোটা জামশেদপুর এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে অগুনতি ক্ষুদ্র শিল্প। যারা বিভিন্ন জিনিস পত্র তৈরী করে বড় বড় কোম্পানীগুলিকে সরবরাহ করে। একমাত্র আদিত্যপুরেই পেবকো, বেবকো, বিদ্যুৎ উদ্যোগ, বিহার প্লাষ্টিক, সিংভূম রিফ্রেক্ট্রীজ, উষা এলোয়েজ, পাইওনিয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং, সুরজ অটোমোবাইল, বডিবিল্ডিং টেলকো, ফেব্রিকেশন,

প্লাস্টিক রবার ইত্যাদি সাড়ে চারশ ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছে।

এই সমস্ত শিল্প সংস্থায় কম করেও দু-লক্ষ লোক কাজ করে। যাদের মাইনে ছ টাকা থেকে দশ টাকা ডেলি রেটে ১৮০ টাকা থেকে তিনশ টাকার মধ্যে। দুশো থেকে তিনশ টাকার মাইনেতে জামসেদপুরে তাদের চলতে পারে না। বস্তি এলাকায় থেকে শ্রমিকেরা কোন ক্রমে কালাতিপাত করার প্রয়াস চালিয়ে যায়। প্রতি মাসে তাদের টাকা ধার করতে হয়। তাছাড়া বস্তি এলাকায় বিশেষত্ব মদ জুয়া তো আছেই যৎকিঞ্চিৎ আয়ের বেশ কিছুটা যায় মদে অথবা জুয়ার আড্ডায়।

ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত প্রদেশে কালো পিচের রাস্তা যেখানে পৌঁছাতে পারেনি সেখানেও মাড়োয়ারীরা পৌঁছে গেছে ব্যবসার প্রয়োজনে, শুঁড়িরা পৌঁছে গেছে মদের ব্যবসা নিয়ে।

অন্যদিকে যেখানেই গড়ে উঠেছে ছোট খাটো শহর কাবুলিওয়ালারা পৌঁছে গেছে টাকার থলি নিয়ে। রমরম করে চালাচ্ছে সুদের কারবার। জামসেদপুরের ক্ষুদ্র শিল্পের কর্মিরা ঠিকাশ্রমিকরা সহজেই ধরা পড়েছে এদের ঋণের জালে। কারণ মাইনে তাদের কম, আপদে বিপদে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কাবুলিওয়ালাদের দিকে। কাবুলিওয়ালা টাকা ধার দেয় মূল চায়না, সুদ চায় চড়া সুদ। মাসে শতকরা দশ টাকা অর্থাৎ কেউ যদি হাজার টাকা ধার করেছে তাহলে মাসিক একশ টাকা হিসেবে বছরে তাকে সুদ গুণতে হয় বারোশ টাকা এমনি করে বছরের পর বছর সুদ দিয়ে যায় কম বেতনের ক্ষুদ্র শিল্পের কর্মীরা। মূল শোধ করার ক্ষমতা নেই সুদ দিয়ে যায় এক হাজার টাকার পাঁচ বছরে ছ' হাজার টাকা। তবু তার মুক্তি নেই কারণ মূল রয়েই গেছে সেই এক হাজার টাকা। টাটানগর স্টেশন থেকে আদিত্য পুর পেমেন্টর দিন কারখানার গেটের সামনে দাড়িয়ে থাকে কাবুলনন্দনেরা। গেট থেকে যেই বেরিয়েছে ওদের খাতক, পকেট থেকে ছোঁ মেরে তুলে নেয় মাইনের টাকার খাম, গুনে নেয় সুদের টাকা বাকিটা ফেরৎ দেয়। ঋণের দায়ে জড়িয়ে পড়া কর্মীদের ঋণের বোঝা যেন গলায় ফাঁস হয়ে আটকে যেতে থাকে দিন দিন। কাবুলিদের অত্যাচার একসময় চরমে পৌঁছাল। সুদ আদায় এক সময় জুলুমে রূপান্তরিত হোল।

নির্মলরা অবাক হয়, সুদুর কাবুল থেকে এরা এখানে এসে জুলুম অত্যাচারের সাহস পায় কোথা থেকে। ক্ষুদ্রশিল্পের কর্মীদের নিয়ে ভাবতে গিয়ে নির্মল দেখল কাবুলিওয়ালাদের সুদের কারবারের ফাঁস থেকে এদের মুক্তি দিতে হবে সর্বাগ্রে। সুসেন, রতিলাল, বিদ্যুৎরা, সমস্ত কাবুলিওয়ালাকে ধরে নিয়ে এল আদিত্যপুরে, গণ আদালতে তাদের বিচার হোল। যাদের মুলের চাইতে সুদ বেশী দেওয়া হয়েছে তাদের মুক্তি দেওয়া হলো, কাবুলিদের ব্যবসা গুটিয়ে চলে যেতে বলল নির্মলরা। সুদের ফাঁস থেকে রেহাই পেল ক্ষুদ্র শিল্পের কর্মীরা কাবুলিদের ব্যবসাও উঠে গেল জামসেদপুর থেকে।

শুধু মাত্র আদিত্যপুর এলাকাতেই সাড়ে চারশো ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছে। দু

লক্ষের মত শ্রমিক কাজ করে সেগুলিতে বেতন হার দৈনিক ছ টাকা থেকে দশটাকা। ওদের চাকরির কোন গ্যারান্টি নেই, যখন তখন ছাঁটাই হয়। নেই কোন প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, মেডিকেল, হাউস এলাউন্স এর সুযোগ সুবিধা। ক্ষুদ্র শিল্পের শ্রমিকদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলল নির্মল। ন্যূনতম মজুরী আদায়ের আন্দোলন হোল প্রথম পদক্ষেপ। তারপরে এল প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ছুটি, মেডিকেল, হাউস এলাউন্স এবং চাকরির নিশ্চয়তা। বর্তমানে ১৫ টাকার নীচে কোন শ্রমিকের বেতন নেই। চাকরির গ্যারান্টি আদায় করেছে তারা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, মেডিক্যাল, হাউস এলাউন্স, ছুটি ইত্যাদি দাবিগুলির শতকরা ৬০ ভাগ আদায় করতে সক্ষম হয়েছে তারা।

বিশেষ করে নির্মল যেটার উপর জোর দিয়েছিল সেটা হোল ল্যাণ্ড লুজার এবং স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগ। নির্মল কৃতকার্য হোল তাতে। দু লক্ষ ক্ষুদ্রশিল্পের শ্রমিকের কাছে নির্মল মাথার মনি হয়ে গেল। এখন নির্মল নেই রতিলাল, চম্পাই সোরেন, বিদ্যাৎরা চালাচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন। নির্মলের দেখানো রাস্তায় তারা পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে কিন্তু ওরা সব সময় নির্মলের অভাব বোধ করছে। আন্দোলন পারিচালনা করার অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারি নির্মল অন্যদিকে ওদের প্রেরণা জোগাচ্ছে অলক্ষে থেকে।

অদ্ভুত এক হেডমাষ্টার

স্বদেশে পুজ্যতে রাজা বিদ্বান পুজ্যতে সর্বত্র। এরকম একটা কথা অহরহ শোনা যায়। একথা ঠিক বিদ্বানরা সর্বত্রই শ্রদ্ধা আদায় করে নেয়। এদেশে শিক্ষকদের মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। অনেক উচ্চ পদাধিকারী সরকারী আমলা, মন্ত্রী, কৃতি সন্তান সকলকেই তাঁর শিক্ষকদের কাছে শ্রদ্ধাবনত হতে দেখা যায়। মাষ্টারদা সূর্য সেনের মত শিক্ষকেরও অভাব নেই এদেশে কিন্তু কুকড়ুহাটের তোলা আদায়কারী হেডমাষ্টার মাধব সিংকে দেখে নির্মল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। ইচাঁগড়ের রাজা কুকড়ু হাটটি ইস্কুলের নামে ইস্কুলের উন্নতিকল্পে দান করেন। এজন্য কুকড়ু হাটের নীলামের ডাক হয় না। হাটের তোলা আদায় করেন হেড মাষ্টার মাধব সিং।

কুকড়ুহাট খুব নামকরা হাট গরু মহিষ কেনা বেচা হয় সেখানে। প্রতি সপ্তাহের তোলা থেকে হাটের আয় সাপ্তাহিক চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা। মাষ্টারী ছেড়ে হেডমাষ্টার মাধব সিং তোলা আদায়কেই একমাত্র কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি টাকা আদায় করেন। অফিসারদের বখরা দেন, এবং বাকিটা নিজের নামে ব্যাঙ্কে জমা করেন। মাধব সিংএর ব্যাঙ্কের টাকার অঙ্ক কয়েক লক্ষে গিয়ে পৌছাল খুব কম সময়ের মধ্যে। অথচ স্কুল বাড়ির টালি ভেঙে ইঁট খুলে অবর্ননীয় দশা, কুকড়ু হোস্টেল ধ্বসে পড়ল। হেডমাস্টার তোলা আদায়ে ব্যস্ত ছেলেদের পড়াশোনাও গোল্লায়।

হেডমাস্টার মশায়ের এখন একমাত্র কাজ টাকা খাইয়ে অফিসারদের বশে রাখা এবং কিছু গুণ্ডা পুষে প্রতিবাদীদের মার দিয়ে ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা রাখা। ১৯৮৪ সালে হাটের তোলা আদায়ের ব্যাপারটা বিহার বিধানসভাতেও উঠল কিন্তু কোন কুল কিনারা হোল না। অবশেষে নির্মল হাজির হোল সেখানে। হাটের মাঝেই হেডমাষ্টারের গনবিচার করল নির্মল, হিকিম, হরেনরা। হাজার হাজার লোকের সামনে হেডমাষ্টারের চুল দাড়ি কামিয়ে, চুনকালি মাখিয়ে সারা হাটময় তাকে ঘোরানো হোল। ইস্কুল না গড়ে হাটের তোলা আদায় করে নিজের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়ানো এবং গুণ্ডাপোষা বন্ধ হোল হেডমাষ্টার মহাশয়ের। ইস্কুলের চেহারা খুবই কম সময়ে পাল্টে গেল। হাটের তোলার টাকায় মাধব সিং যে সমস্ত জমিজমা বাঁধ বাগান কিনেছিল, নির্মলরা সেগুলি গ্রামবাসীদেরকে বিলি করে দিল।

অজিত ধনঞ্জয়ের মুখাগ্নি

১৯৮২ সালে চাণ্ডিল থানায় ক্রান্তিকারী যুবছাত্র মোর্চা নামে একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়ে ওঠে ছাত্রদের নিয়ে। রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিকিম, হরেন, অশোক ওঁরাও খগপতিদের নেতৃত্বে এই সংগঠন গ্রামোন্নয়নের কাজে দারুনভাবে সক্রীয় হয়ে ওঠে বি. ডি. ও. অফিস ঘেরাও করে, কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচীর দাবীতে। পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায় ছাত্রদের মিছিলে, ঘটনাস্থলেই পুলিশের গুলিতে মারা যায় অজিত মাহাত ও ধনঞ্জয় মাহাত। ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে সকলে, আচমকা এই গুলি চালনায়। অজিত ধনঞ্জয়ের রক্তাক্ত দেহদুটি পুলিশ নিয়ে যায় হাসপাতালে।

ছাত্ররা এতই ভয়ভীত হয়ে পড়েছিল যে মৃতদেহ গুলি হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসার মত সাহস কারুর ছিল না। পুলিশ তাদের দুস্কর্ম ঢাকতে গুজব ছড়াচ্ছিল, ছড়াচ্ছিল সন্ত্রাস। নির্মল খবর পেয়ে ছুটে যায় সেখানে। হাসপাতাল থেকে অজিত মাহাত, ধনঞ্জয় মাহাতর মৃতদেহ নিয়ে চাণ্ডিলে শোক মিছিল করে। নির্মলের আগমনে ছাত্ররা কিছুটা সাহস পায়। পুলিশ এতই গুজব এবং সন্ত্রাস ছড়িয়েছিল যে অজিত ধনঞ্জয়ের শেষকৃত্যের সময় ওদের বাড়ীর লোকেরাও আসতে সাহস পায়নি। অবশেষে নির্মলই ওদের মুখাগ্নি করে চিতায় তুলে দেয়। ২১ অক্টোবর ১৯৮২ অজিত ধনঞ্জয় শহীদ হলেন। নির্মল ৫ নভেম্বর অজিত ধনঞ্জয়ের মৃত্যুর জন্য দুটি পরিবারকেই ক্ষতিপূরণ হিসেবে এক লক্ষ টাকা করে দিতে হবে দাবী করে গোলচক্র জ্যাম করার ডাক দেয়।

ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর গোলচক্র জ্যামের আহ্বান শুনে সবাই চমকে যায়। ব্যস্ততম এই রাস্তাটি অবরোধ মুক্ত করতে পুলিশ যে সবরকম ব্যবস্থা নেবে এটা ভেবে সবাই শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কিন্তু অন্যদিকে জনতাপার্টির রোশন লালভাটিয়া, কংগ্রেস এর সুরেশ খৈতান, গোবিন্দ মাহাত ইত্যাদি নেতারা নির্মলের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এবং ক্রান্তিকারী যুবছাত্র মোর্চার কর্মীরা

এই অবরোধে যোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। নির্মলের নামে তখন অগুনতি ফৌজদারী মামলা। উলিয়ানের কেউ ভয়ে ওর সঙ্গে যেতে চায় না। নির্মলের হাতে তখন একটা সাইকেলও নেই, চাইলেও কেউ দিতে চায় না। সুনীল নির্মলের সিদ্ধান্ত শুনে চমকে উঠে, গোলচক্র অবরোধ! সুনীল বলে কেউ তোমার সঙ্গে যাবেনা উলিয়ানের। নির্মল বলে জানি, তুমি যাবে কিনা তাই বল। সুনীল বলে, আমি না হয় যাব কিন্তু যাবে কিসে, কেউ তোমাকে একটা সাইকেলও দেবে না। নির্মল বলে, জানি, তবু যেতে হবে সুতরাং একটা কিছু ব্যবস্থা তোমায় করতে হবে। যদি না পাই কিছু সূবর্ণরেখা পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছাব গোলচক্র। সুনীল বলে তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, আজকেই ৫ নভেম্বর সকাল ৯টার সময় তুমি গোলচক্র অবরোধের ডাক দিয়েছ এখন বাজে দশটা হেঁটে গেলে গোলচক্র পৌঁছাতে তোমার সন্ধ্যা হয়ে যাবে। নির্মল অধির হয়ে ওঠে, সুনীল তুমি বুঝছ, আমাকে যেতেই হবে ওখানে, রাঁচী থেকে ছাত্ররা আসবে, গোটা চাণ্ডিল এলাকা থেকে ছাত্ররা জড়ো হবে সেখানে, আমি ওদের কথা দিয়েছি, আমি যাবো না! অগত্যা দুজনে বেরিয়ে পড়ে মোটর সাইকেলের সন্ধানে।

জামশেদপুরের পরিচিত গ্যারেজগুলোতে ওরা প্রথমে খোঁজ নেয় সারানোর জন্য কারও মোটর সাইকেল আছে কি না কিন্তু পাওয়া যায় না। হঠাৎই দেখা হয়ে যায় পেন্টিং এর কর্মী রামচন্দ্রর সঙ্গে। রামচন্দ্র নির্মলের পরিচিত ছেলে। ও ওদের দেখতে পেয়েই জিজ্ঞাস করে কোথায় যাচ্ছে ওরা। নির্মল ওকে বলে, "একটা মোটর সাইকেলের প্রয়োজন এক্ষুনি, একটা বিশেষ কাজে চাণ্ডিল যেতে হবে।" সঙ্গে সঙ্গে নিজের নতুন মোটর সাইকেলটি দিয়ে দেয় রামচন্দ্র। নির্মলের পকেটে তেল কেনারও পয়সা ছিল না। সুনীল ট্যাঙ্ক খুলে দেখে মোটর সাইকেলে তেল আছে অনেক। ওরা বেরিয়ে পড়ে গোলচক্র অভিমুখে।

গোলচক্রের ঠিক আগে দেখা হয়ে যায় একজন ছাত্রের সঙ্গে। ওবলে গোলচক্রে প্রচুর পুলিশ ছেলেদের মারধোর করছে। ওরা তোমারই খোঁজ করছে। যেওনা মারধোর করবে ওরা। নির্মল সুনীলকে বলে চলো যেতেই হবে ওখানে। নির্মল ওখানে পৌঁছাতেই পাহাড়ের ওপর থেকে ছাত্ররা শ্লোগান তোলে, "নির্মল মাহাত জিন্দাবাদ।" নির্মল ওখানে পৌঁছাতেই চারিদিক থেকে ছুটে আসে সশস্ত্র পুলিশের জীপ। নির্মলকে ওরা গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার হয় রোশন লালভাটিয়া, সুরেশ খৈতান, গোবিন্দ মাহাত প্রমুখ নেতারাও।

অক্লান্ত কর্মী নির্মল

এখন বাড়ীর সঙ্গে প্রায় ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে নির্মলের। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ছুটে বেড়ায় এখানে ওখানে। সোনারীর কেবল মাহাতর বাড়ীতে কখনও কখনও এসে থাকে, খায়। অন্য সময় নির্মলের ঠিকানা জানে কেবল অন্তরঙ্গ কিছু কর্মী।

ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সভাপতি হওয়ার পরে কাজ বেড়ে গেছে, নির্মলের এখন শুধু জামশেদপুর নয় সিংভূম নয়, রাঁচী, ধানবাদ, গিরিডি, হাজারিবাগ, পালামো, সাঁওতাল পরগণা, ময়ুরভঞ্জ, কেঁওঝর, সুন্দরগড়, সম্বলপুর, রায়গড়, সরগুঁজা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ছুটে বেড়াতে হয় তাকে, পার্টির কাজে সংগঠনের কাজে। বাড়ি আসা হয় না তেমন।

বাবা জগবন্ধু মাহাত ছাড়া বাড়ীতে দেখাশোনার মত তেমন কেউ নেই, দাদা বিমল কিছুটা নির্লিপ্ত। দিদি শান্তি এবং জামাইবাবু শ্রীকান্তবাবুকে নির্মল ওদের বাড়ীতে এসে থাকতে বলে। শ্রীকান্তবাবুদের বাড়ী ঘাটশিলার চড়িদাতে। ওখানকারই একটা মিড্‌ল স্কুলের শিক্ষক উনি। নির্মলের কথায় না করতে পারেন না, তিনি। কিছুদিন পরে ঘাটশিলা থেকে ট্রান্সফার করিয়ে উনি সপরিবারে চলে আসেন নির্মলদের বাড়ীতে। জামশেদপুরেরই আশেপাশে একটা স্কুলে এখন উনি শিক্ষকতা করছেন। নির্মলের অবর্তমানে উনি দেখাশোনা করেন, নির্মলের ভাইদেরকে। ভাইদের মধ্যে সুশীল বি. কম পাশ করে টিস্কোতে চাকরি করছে, সুধীরও চাকরি করছে টাটা মেইন হসপিটালে, প্রদীপ বি.এ. পাশ করেছে, অশোক ইন্টারমিডিয়েট পড়ছে, অসীম, অসিত যথাক্রমে স্কুল ফাইন্যাল পাশ এবং মিড্‌ল স্কুলের ছাত্র। নির্মল কখনও বাড়ী এলে দিদির ওখানে খাওয়া দাওয়া সেরে নেয়। জামাইবাবু শ্রীকান্ত বাবুর সঙ্গে পারিবারিক এবং অন্যান্য বিষয়ে গল্প করে চলে যায়।

নির্মলের এখন অনেক কাজ, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত চরকির মত ঘোরে নির্মল এ গ্রাম থেকে সে গ্রাম, দরীদ্র মানুষদের পাশে দাঁড়ায়, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্দোলন করে। দিনরাত শুধু কাজ আর কাজ। দিনরাত কাজ করেও একফোঁটা ক্লান্তি নেই নির্মলের।

সিংভূম জেলার কৃষি উৎপাদনের জিনিষপত্রের উপর ১ শতাংশ ট্যাক্স বাঁধল বিহার সরকার। নির্মল বিরোধীতা করল। একসপ্তাহ বন্ধ রইল আদিত্যপুর মার্কেট। হলুদপুকুর গামারিয়া, রাজনগর, কান্ড্রা, আদিত্যপুরে কৃষি উৎপাদনের জিনিষপত্রের উপর ১ শতাংশ ট্রাক্স এখনও পর্যন্ত চালু করতে পারেনি বিহার সরকার। টাটা কোম্পানীর নোটিফায়েড এরিয়াতে হোল্ডিং ট্যাক্সও চালু করতে দেয়নি নির্মল।

স্কুলে, কলেজে পড়ার জন্য কাষ্ট, ইনকাম এবং রেসিডেনসিয়াল সার্টিফিকেট দিতে হয় ছেলেদের। ব্লক অফিস গুলিতে এনিয়েও ঘুষের কারবার চলে রমরমিয়ে। একবার একটি ছেলে এসে নির্মলকে বলল, গামারিয়া ব্লকের কেরানিরা ঘুষ ছাড়া সার্টিফিকেট দিতে চাইছে না। নির্মল ছুটল গামারিয়া ব্লকে। ভারপ্রাপ্ত কেরাণীকে সার্টিফিকেট দিতে বলল। কে নির্মল, নির্মলের কথা কেন শুনবে ঘুষখোর কেরানী। সার্টিফিকেট দিতেও অস্বীকার করল। কোথাও অন্যায় দেখলে, জুলুম দেখলে পায়ের রক্ত মাথায় উঠে যায় নির্মলের। রাগের মাথায় কয়েকটা থাপ্পড় কষিয়ে দেয় কেরাণীর মুখে। এরপর থেকে কাষ্ট ইনকাম রেসিডেনসিয়াল সার্টিফিকেট নিয়ে ঘুষের কারবার

বন্ধ হয়ে যায়, গামারিয়া ব্লকে কিন্তু কেরানী মামলা করে কোর্টে নির্মলের বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তার হয় নির্মল।

গাঁজিয়া ডেমে, জামশেদপুরে এবং অন্যান্য অনেক জায়গাতেই ঠিকাদার শ্রমিকদের নুন্যতম মজুরীর জন্য আন্দোলন করে নির্মল। ঠিকাদারদের দেওয়া ৫/৬ টাকা রেটের জায়গায় নির্মলের দাবী ১৫ টাকা। সহজে কি মানতে চায় ওরা। গাঁজিয়া ডেমে ঠিকাদারদের বেঁধে শ্রমিকদের গণআদালতে বিচার করে নির্মল। রেট বাড়াতে বাধ্য হয় ঠিকাদাররা।

একদিকে দরিদ্র, মেহনতি মানুষদের ভগবান হয়ে উঠছিল নির্মল অন্যদিকে পুঁজিপতি, বুর্জোয়া মুনাফাখোরদের, শোষনকারী, জুলুমবাজদের চরম শত্রু হয়ে উঠছিল নির্মল। নির্মল হয়ে উঠেছিল ওদের পথের কাঁটা চোখের বালি। কিন্তু পার্টির ভিতরে পার্টিকর্মীদের মধ্যে নির্মল ছিল সমালোচনার উর্দ্ধে অবিসম্বাদি নেতা নির্মলদা। নির্মল ছিল, ছেলে, মেয়ে, বুড়ো সবারই নির্মলদা! নির্মল তার আচরন জীবনযাত্রা সবকিছুতেই যেন নিজের নির্মল নামটাকে সার্থক করে তুলেছিল।

হাইস্কুলে পড়ার সময় থেকেই নির্মল নিজের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের টিউশনি পড়িয়ে বাড়ীতে সাহায্য করত। ছোটবেলা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনরকম খারাপ অভ্যাস নির্মলের মধ্যে দেখা যায় নি। বিড়ি-সিগারেট, খৈনি, গুড়াকু, মদ কোনকিছুই সে স্পর্শ করেনি কোনদিন। নির্মলের মুখ থেকে কেউ কোনদিন খারাপ ভাষায় গালিগালাজ শোনেনি। সদাহাস্যময় নির্মল কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিরও মোকাবিলা করে অত্যন্ত সহজভাবে। খুব অল্প সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া নির্মলের এক বিরাট গুণ।

ছেলেবেলা থেকেই নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা ছিল ওর। আশে-পাশে অন্যান্য ছেলেদের থেকে সবসময়ই তাকে আলাদা করে নেওয়া যেত। উলিয়ান গ্রাম কদমার পাশেই এবং জামশেদপুরের সঙ্গে সংলগ্ন। খড়কাই এবং সূবর্ণরেখা উলিয়ানকে গ্রামাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সুতরাং উলিয়ানের ছেলেদেরকে গ্রামের চাইতে শহরই বেশী আকৃষ্ট করে কিন্তু নির্মল তাদের থেকে আলাদা ছিল। চুপচাপ বসে থাকা ওর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল, নিজেকে কোন না কোন কাজে সবসময় ব্যস্ত রাখত।

১৯৭৬ সালে টিস্কোর গুণ্ডাপার্টি উলিয়ান গ্রামের কেষ্ট মজুমদারের পানগুমটি জোর করে তুলে নিয়ে যায় ট্রাকে। নির্মল খবর পাওয়া মাত্র নিজের সঙ্গী সাথী এবং গ্রামবাসীদের নিয়ে টিস্কোর টাউন অফিস ঘেরাও করে। বিষ্টুপুর থানার দারোগা বাচ্চু সিং টিস্কোকে মদত দেওয়ার জন্য ছুটে আসে কিন্তু নির্মল নির্বিকার। নির্মল কেষ্ট মজুমদারের গুমটি নিয়েই ফেরে এবং যেখানে ছিল সেখানে আবার বসায়। কেষ্ট মজুমদার এখনও সেই গুমটি থেকে সংসার চালাচ্ছে।

নির্মল সোজাপথে চলায় বিশ্বাসী ছিল। সমস্যা সামনে এলে তার নিষ্পত্তি না

করে ও ছাড়ত না। ভাষন বক্তৃতায় ও বিশ্বাসী ছিল না। আগে কাজ, কাজের জন্য মাঠে নেমে পড়া, পরে ভাষন আর বক্তৃতা। ছেলে থেকে বুড়ো পর্যন্ত সবারই নির্মলদার কাজে বিশ্রাম ছিল না কখনও। যে কোন সময় কেউ না কেউ এসে হাজির, "নির্মলদা চলুন, ওখানে জুলুম হচ্ছে, অন্যায় হচ্ছে। অমনি বেরিয়ে পড়ে নির্মল। ১৯৮৭ সালের গোলচক্করে এক ট্রাক দুর্ঘটনায় ৬ জন কুলি নিহত হয়। খবর পাওয়া মাত্র নির্মল ছুটে যায় সেখানে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করে এবং নিহতদের পরিবারে কুড়ি হাজার করে টাকা দেওয়ার জন্য ট্রাকমালিককে বাধ্য করে। পালেয়ান, মস্তানদের দ্বারা জামশেদপুরের চারদিকে হাজার হাজার একর জমি জবরদখল হয়েছে এবং এখনও সেই প্রক্রিয়া চালু আছে। নির্মল এই জুলুমের বিরুদ্ধে লাগাতার সংঘর্ষ করেছে। ভাটিয়াবস্তির দূর্গামন্দির সার্বজ্জনীন সম্পত্তি, কিন্তু ওখানকার ঠিকাদার শিবমনি সিং জোরকরে দখল করার চেষ্টা করছিল। নির্মল ওকে আটকায় এবং জবরদখল বন্ধ করে। এভাবেই টিস্কো সামুদায়িক বিকাশ কেন্দ্রের কাছে ৩০ বছর থেকে দুর্গাপুজার জন্য ব্যবহৃত মাঠ টিস্কোর জবরদখল থেকে মুক্ত করে নির্মল। এমনই একটি লড়াই ছিল-বিমানবন্দরের আশেপাশে শতাধিক একর জমি রাতারাতি দখল করার চেষ্টা করে টিস্কো। নির্মল বাইরে থেকে এসে হঠাৎ জানতে পারে ব্যাপারটা। গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে নির্মল সোজা টিস্কোর বেআইনী দেওয়াল ভেঙে ফেলে এবং টিস্কোর জবরদখল বন্ধ করে।

মঙ্গল সিং পালোয়ান উলিয়ানের কিছু ভূমিজ আদিবাসীর জমি কব্জা করে নিয়েছিল। নির্মল এর বিরুদ্ধেও আওয়াজ তোলে। মঙ্গল সিং ভূমিজদের জমি ফেরৎ দিতে বাধ্য হয়। এরকম অগুনতি লড়াইয়ে ও অংশগ্রহণ করে। নির্মল মাহাত শুধু মাত্র একজন আন্দোলনকারীই ছিলনা, শোষনমুক্ত ঝাড়খণ্ডের স্বপ্নও দেখতো নির্মল। জঙ্গল বাঁচানোর জন্য অনেক আন্দোলন করেছে ও। গাছ লাগানোর জন্য লোককে উৎসাহ দিত নিজেও গাছ লাগাত। ১৯৮৬ সালে দোমহনীর জঙ্গল বাঁচানোর জন্য ও আন্দোলন করে। ও দাবী করে জঙ্গলের ধারে ইঁটভাটাগুলি হটিয়ে দেওয়া হোক। কারণ তাতে নদী কিনারায় মাটি ক্ষয়ে যাচ্ছে এবং জঙ্গল নষ্ট হচ্ছে। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে দোমহনীর জঙ্গলকে ঘিরে ফেলে নির্মল।

১৯৮৫ সালে গামারিয়া ব্লকের সাঁপড়া সাহরবেড়া গ্রামের জঙ্গলকে রক্ষা করার জন্য ও আন্দোলন শুরু করে। ওখানকার লালুবাবু সিং নামক ব্যক্তি সরকারী জঙ্গল কেটে বনবিভাগের জমি জবরদখল করছিল। নির্মল এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে গ্রামবাসীদের নেতৃত্ব দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় অসাধু পুলিশ লালুবাবুকে মদত দিতে ছুটে আসে এবং আন্দোলন বন্ধ করে দেয়। এবং আরও দুর্ভাগ্য উক্ত অসাধু পুলিশ অফিসারের জন্য এখনও ঐ লালুবাবু সিং জঙ্গল কেটেই চলেছেন এবং বনবিভাগের জমি জবরদখল করেই চলেছেন।

নির্মল অনেক জায়াগায় স্কুল তৈরীর জন্য আন্দোলন করে এবং বেশকিছু গ্রামে

নিজের চেষ্টায় স্কুল তৈরী করতে সক্ষম হয়। শহীদ অজিত মাহাত এবং শহীদ ধনঞ্জয় মাহাতর স্মৃতি হিসেবে শহীদ অজিত-ধনঞ্জয় বিদ্যানিকেতন এরকমই একটি প্রচেষ্টার উদাহরণ।

দিন আনা দিন খাওয়া শ্রমিকদের জন্য নির্মলের চিন্তার শেষ ছিলনা। জামশেদপুরে এরকম হাজার শ্রমিকের সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে বসবাস করার কোন আস্তানা ছিল না। নির্মল এরকম শ্রমিকদের জন্য বস্তি তৈরী করে। সোনারী এবং উলিয়ানের মাঝখানে জনতা বস্তি নির্মলের এরকম প্রচেষ্টার সফল উদাহরণ। দোমহনীর জঙ্গলের কিনারায় ডোমদের বস্তি উচ্ছেদের চেষ্টা করে টিস্কো কিন্তু নির্মলের আন্দোলনের ফলে টিস্কোর সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

নির্মল ঝাড়খন্ড আন্দোলনকে সমাজবাদী আন্দোলনে রূপান্তরিত করার জন্য আদিত্যপুর এলাকায় রতিলাল মাহাতর নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলন জোরদার করে। নির্মল ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার দ্বারা প্রতিবছর মে দিবস পালন শুরু করে। টিস্কোর ফ্ল্যাট বানানোর ঠিকাদার শপুরজী-পালামজির শ্রমিকরা নির্মলের কাছে নালিশ করে যে ওদেরকে মজুরী দিচ্ছে না ঠিকাদার। নির্মলের চাপে শেষ পর্যন্ত ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার অফিসে এসে ঠিকাদার শ্রমিকদের পাওনা দেড়লাখ টাকা মিটিয়ে দিতে বাধ্য হয়। নির্মল টিস্কোর স্বাস্থ্যবিভাগের প্রায় এক হাজার হরিজন আদিবাসী শ্রমিকের গেটপাস, টিকিট এবং পার্সোনাল নাম্বার আদায় করে দেয় এবং টিস্কোর যখন তখন ছাটাই বন্ধ করে। বর্তমানে এই শ্রমিকদের বেশীর ভাগই স্থায়ী চাকরীর অধিকারী হয়েছে। মোর্চার দ্বিতীয় মহাধিবেশনে ২৭,২৮ ও ২৯ এপ্রিল '৮৬তে রাঁচীতে ছাত্র সংগঠন গড়ার প্রস্তাব দেয়। মহাধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বোকারোতে ১লা জুন ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চায় কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে অল্ ঝাড়খন্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়ান গঠিত হয়। শুধু তাই নয় ১৯৮৬ সালের ২৭ শে অক্টোবর জামশেদপুরে অখিল ঝাড়খন্ড ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবি সম্মেলনের আয়োজন করে ছাত্র সংগঠনকে জাতীয় স্তরে তুলে ধরে এই সম্মেলনের আর্থিক দায়িত্বও গ্রহণ করে নির্মল।

ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার মত একটি বিরাট সংগঠনের সভাপতি হওয়া কম কথা নয় কিন্তু এজন্য নিজের উপর এতটুকু অহঙ্কার ছিল না নির্মলের, কারণ ঐ পদের চাইতেও অনেক বড় ছিল নির্মল। নির্মলের কাছে পদের চাইতে কাজ ছিল অনেক বড়। এজন্য কোথাও গেলে নির্মলের নাম শুনেই লোক ছুটে আসত ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার সভাপতিকে দেখতে নয় নির্মলকে দেখতে। আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে নির্মল তার কাজ কর্মের দ্বারাই জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত লাভ করত বক্তৃতার জন্য নয় তার কাজের জন্য।

নির্মল যখন ততটা পরিচিত হয়নি জামশেদপুর থেকে ঝাড়খন্ড পার্টির প্রার্থী হয়ে বিধানসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যায়। দ্বিতীয় বার ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার

প্রার্থী হয়ে ইঁচাগড় বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এবং খুব কম ব্যবধানে হারে। রাঁচী লোকসভা কেন্দ্র থেকেও ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। জিততে পারেনি নির্মল। কিন্তু ভোটে হেরে যাওয়ার পর এক মুহূর্তও থেমে থাকেনি নির্মল। ভোটে হেরে নির্মল বলত, "ঠিক হয়েছে, ভোটে জিতলে সাধারাণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতাম।" ইঁচাগড়ের বিজয়ী প্রার্থী আদিত্যদেবের কাছে ইঁচাগড়ের গ্রামবাসীরা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য গেলে, আদিত্যদেব বলতেন, 'নির্মলের কাছে যাও, গ্রাম গঞ্জের কাজ ওর, আমার কাজ পাটনায়"। পাটনায় উনি কি কাজ করেন উনিই জানেন কিন্তু নির্মল ইঁচাগড় কেন গোটা সিংভূম এলাকার সত্যিকারের জনপ্রতিনিধি ছিল। বিভিন্ন সমস্যা জর্জরিত গ্রামবাসীরা ছুটে আসত নির্মলের কাছে সমাধানের আশায়।

নির্মলের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। দূর দূরান্তের কোন গ্রামের বাসিন্দার সঙ্গে কয়েক বছর পরে হঠাৎ কোথাও দেখা হলে এক মুহূর্তেই চিনে ফেলে নির্মল। জিজ্ঞেস করে ওর বাড়ির কথা, অন্যান্য সমস্যার কথা। প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী নির্মল কখনও কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে ভয় পায় না। যে কোন লোককে সঙ্গে নিয়ে চলার সাহস ছিল ওর। ওর বিশ্বাস ছিল খারাপ লোককেও ও সুপথে নিয়ে আসতে পারবে এবং শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাসই ওর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল।

নির্মলের নিয়ন্ত্রণে ছিল লক্ষ লক্ষ টাকা কিন্তু জনসাধারণের সম্পত্তিকে কখনও নিজের কাজে ব্যবহার করেনি। সে যে কোন লোকের বাড়িতে শাকভাত খেয়ে, কারো বাড়িতে ছেঁড়া খাটে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। নিজের জন্য চিরকুমার নির্মল কিছুই করে নি। কখনও কিছু খাবার পেলে কর্মীদের সঙ্গে ভাগ করে খায়। কর্মীরা দেখে নির্মল কখনও নেতা হিসেবে ওদের ওপর খবরদারী করে না। সব সময় মনে হয় নির্মলদা যেন ওদের স্নেহময় বড়দা।

নির্মলের ইতিহাস দরিদ্র জনসাধারণের হয়ে সংগ্রামের ইতিহাস, দরিদ্র কৃষক, শ্রমিকের হয়ে সংগ্রামের ইতিহাস, ঝাড়খন্ডীদের আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসম্মান প্রদান করার জন্য সংগ্রামের ইতিহাস। আচার, আচরণ, বিশ্বাসে সমাজবাদী নির্মলের অকালমৃত্যুতে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা এক বিরাট ধাক্কা পেল কিন্তু ওর আন্দোলনের মাধ্যমে তৈরি হওয়া অনুপ্রাণিত হওয়া হাজার হাজার যুবক ওর শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে কিনা তা বলে দেবে আগামী কাল।

জামশেদপুরের কেঁওটরা

পুরানো জামশেদপুরের বাসিন্দা কেঁওটদের কথা এখন প্রায় সবাই ভুলেই গেছে। খড়কাই আর সুবর্ণরেখার ধারে ধারে ঝুপড়ি করে এরা থাকে। গোটা জামশেদপুর জুড়েই ছড়িয়ে আছে এরা। সুবর্ণরেখার জলে খড়কাই এর জলে এরা মাছ ধরে বাজারে বিক্রী করে জীবিকা নির্বাহ করে। আষাঢ় শ্রাবণে বানের জল বেয়ে উঠে

আসে নানা রকমের মাছ। জাল দিয়ে ধরে এরা। তাছাড়া অন্য সময়েও সুবর্ণরেখা আর খড়কাই-এ মাছ থাকে প্রচুর। জাল, পলুই, পালি, ঘুনি মাছ ধরার বিভিন্ন কৌশল এদের জানা। বিকেলবেলা নদীর জলে ডুবিয়ে আসে ঘুনি, তুলে আনে ভোরবেলা। সেই মাছ মেয়েরা বাজারে নিয়ে যায় বেচতে। সেই থেকে হয় এদের ভাত কাপড়ের সংস্থান।

কেব্‌ল, জেমপো, টেলকো, টিসকো ইত্যাদির কারখানার বিষাক্ত জল ঢুকছে খড়কাই এর জলে। খড়কাই এর জল মিশে যাচ্ছে সুবর্ণরেখায়। বিষাক্ত হয়ে উঠেছে দুই নদীরই জল। নদীতে মাছ কমতে শুরু করেছে অনেকদিন থেকেই, এরা তখন অতটা ভাবেনি। কিন্তু এখন আর সুবর্ণরেখা খড়কাইয়ে মাছ নেই। জাল ফেলে ফেলে থকে যায় কেঁওটরা, মাছ ওঠে না জলে। অভ্যেস মত সন্ধ্যেবেলা নদীর জলে ঘুনি রেখে আসে জেলেনিরা। ভোরবেলা গিয়ে তোলে। আগেকার দিনে চিংড়ি মাছে ভরে থাকত ঘুনি এখন আর মাছ ঢোকেনা ঘুনিতে।

জেলেরা প্রথম প্রথম মানত করত নদীর জলে, দেবতার থানে কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছে কারখানার বিষাক্ত ময়লা জল ঢুকে ঢুকে বিষিয়ে গেছে সুবর্ণরেখা আর খড়কাই এর জল। মাছ আর বাঁচেনা এই জলে। জেলেরা এখন নিরুপায় পিতৃ পিতামহের বৃত্তি তাদের বন্ধ। কিন্তু কি করবে তারা। নির্মল এদের নিয়ে সংগঠন তৈরি করে। টেলকো টিসকোর কাছে। জেলেদের বিকল্প বৃত্তির দাবী করে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তারা।

নির্মল থাকলে তাদের এই দাবী হয়তো মেনে নিত কারখানার কর্মকর্তারা কিন্তু নির্মল এখন নেই। রতিলাল, সুসেন, বিদ্যুৎ, চম্পাই সোরেন, মাছুয়া গাগরাই এরা চালিয়ে যাচ্ছে আন্দোলন। ভবিষ্যতে বিকল্প বৃত্তি পেলে জেলেরা হয়ত কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচবে।

ডায়েরির একটি সাদাপাতা

ছোটবেলা থেকেই ঘরের কাজে দায়িত্বশীল নির্মল রান্নাবান্নার কাজে মাকে সাহায্য করে। ভাইদের স্নান করায়, খাওয়ায় স্কুলে পাঠায়। মায়ের অবর্তমানে ভাইএরা বুঝতেই পারেনা মায়ের অভাব। স্কুলে পড়ার সময় থেকে টিউশনি করে টাকা রোজগারের চেষ্টা করে। খুবই সামান্য টাকা মাকে দেয় সংসার চালানোর জন্য। আনন্দে বুক ভরে যায় মা প্রিয়া মাহাতর। বিরাট সংসারটাকে যেন বুক দিয়ে আগলে রাখতে চায় নির্মল।

খুব সুন্দর আলপনা বানায় নির্মল। উলিয়ানের মেয়েরা অবাক হয়ে দেখে ওর আলপনা। মেয়েরা দলবেঁধে আলপনা আঁকা শিখতে আসে নির্মলের কাছে। মদ, গাঁজা, হাঁড়িয়া, বিড়ি, সিগারেট, চা, পান কিছু ছোঁয়না নির্মল। শহরতলীর বাজে অভ্যাসগুলি ঘেঁষতে পারে না ওর ধারে কাছে। মদ জুয়ার আড্ডা ভেঙে যায় নির্মলের উপস্থিতিতে। ছফুট লম্বা সুগঠিত দেহ সুপুরুষ নির্মল, মেয়েদের অসম্মান সইতে

পারেনা এক বিন্দুও। মেয়েদের সম্মান বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করেও ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্মল। কিন্তু কোন মেয়ের উপর নির্মলের দুর্বলতা ছিল একান্ত অন্তরঙ্গ আবাল্যবন্ধু পিসতুতো ভাই সুনীলও বলতে পারেনা। বলতে পারে না, ভাই সুশীল, সুধীর খেলার সাথী চিন্ময়, বাবুলাল, বলতে পারেনা অন্তরঙ্গ পার্টিকর্মী শৈলেন্দ্র, সুসেন, চম্পাই সোরেন, মাছুয়া গাগরাই, লক্ষ্মী কুন্ডু কেউই।

বাবা জগবন্ধু মাহাত, মা প্রিয়া মাহাত, দিদি শান্তি, জামাই শ্রীকান্তবাবু, সবাই ভাবে নির্মলের বিয়ের কথা, ভাইদেরও। বড় হচ্ছে ছ'ছটা ভাই নির্মলের, সবাই অবিবাহিত বিয়ে হয়েছে কেবলমাত্র, দাদা বিমলের এবং দিদি শান্তির। বয়স হচ্ছে বাবা জগবন্ধু আর মা প্রিয়া মাহাতর। ওরা সব ছেলেমেয়েরই বিয়ে দিয়ে সুখশান্তির ঘরকন্না দেখে যেতে চায় সবারই। একে ওকে দিয়ে নির্মলের কাছে ওর বিয়ের প্রস্তাব করে নাকচ করে দেয় নির্মল। ছোটবেলা মায়ের কাছে কাছে ঘুরত নির্মল। নির্মল যত বড় হোল প্রিয়া মাহাতর কাছ থেকে, দিদি শান্তির কাছ থেকে, গোটা পরিবার থেকেই যেন ধীরে ধীরে অনেক দূরে সরে গেল। এখন ওর অনেক কাজ, কেন ঘুরে বেড়ায় কে তার খবর দেবে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জনসাধারণের কাজ করে যে নির্মল। কোথায় খায়, কোথায় শোয়, তার ঠিক নেই। আপনভোলা নির্মলের কথা ভাবতে ভাবতে বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে মা প্রিয়া মাহাতর, বাবা জগবন্ধু মাহাতর দিদি শান্তির।

নির্মল হঠাৎ কোন কোনদিন বাড়ি আসে, দিদি শান্তির ওখানে খেয়ে নেয়। জামাই শ্রীকান্তবাবুর সঙ্গে পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে। ছোট ছেলেমেয়েদের বড় ভালবাসে নির্মল। ভাগনেদের কোলে নেয় আদর করে। শ্রীকান্তবাবুর সঙ্গে আন্দোলনের ব্যাপারে, নিজের কাজকর্মের ব্যাপারে সমস্যা নিয়েও অন্তরঙ্গ আলোচনা করে নির্মল। তরপর হুট করে চলে যায় প্রোগ্রামের তাড়ায়। শ্রীকান্তবাবুও নির্মলকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল, না করে দেয় নির্মল।

অবশেষে নির্মল প্রস্তাব দেয় ভাই সুশীলের বিয়ের। বড়ভাই থাকতে ছোটভাই এর বিয়ে! আঁতকে ওঠে মা বাবা পাড়াপড়শীরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হয়। বড় ধুমধাম করে ভাই সুশীলের বিয়ে দিল নির্মল। এমন আয়োজন কুড়মিদের সমাজে কেউ কোনদিন দেখেনি। ফকির থেকে আমীর, সুশীলের বিয়েতে সবাই আমন্ত্রিত। কোন বাছবিচার নেই। হাজার হাজার লোক আসে খায় দায় চলে যায় বিয়ে নয় এ যেন মহোৎসব। ঝাড়খন্ডীদের মিলন মহোৎসব।

আপুস, কুটুম, বন্ধুবান্ধব শুভাকাঙ্খীরা অনেকেই জিজ্ঞেস করে নির্মলকে "এত ধুমধাম করে ভাই এর বিয়ে দিলেন, নিজে বিয়ে করবেন না?" নির্মল হাসতে হাসতে জবাব দেয়, "আমি এই আছি এই নেই, আমার কি বিয়ে করা সাজে?" রাজনৈতিক কর্মী, আন্দোলনের কর্মী, পার্টি কর্মীদের বলে, আমার বিয়ে হয়ে গেছে সিধু কানুর 'হুল' এর সঙ্গে, বিরসা মুন্ডার উলগুলান' এর সঙ্গে, নতুন করে আর বিয়ে করার

প্রশ্নই ওঠে না।"

সাঁওতালি 'হুল' আর মুন্ডারী 'উলগুলান' এর সঙ্গে প্রেম হয়েছিল নির্মলের 'বড় গভীর সেই প্রেম, তাই অন্য কোন মেয়েকে আর ওদের সতীন হিসেবে জড়াতে চায়নি নির্মল। কোন মেয়ে কখনও ওর জন্য পথ চেয়ে থাকত কিনা কেউ জানে না। ডায়েরীর একটা পাতায় কোন কিছু লেখা হয়নি কোনদিন। কালির আঁচড় পড়েনি এক ফোঁটাও।

কিন্তু কিছুদিন আগেও যে মেয়েরা উলিয়ান, কদমা, সোনারীর বুকে গুন্ডামীর জ্বালায় স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করতে পারতো না, গুন্ডাদের জ্বালায় নিজের বাড়িতে থেকেও নিশ্চিন্তে থাকতে পারত না যে যৌবনবতী মেয়েরা, নির্মল গুন্ডামীকে উলিয়ান, কদমা, সোনারী থেকে উৎখাত করে ওদের মুক্তি দিয়েছিল। তাই নির্মলের হঠাৎ মৃত্যু সংবাদে ওদের মাথায় বাজ পড়েছিল। সোনারী, কদমা, উলিয়ান এর মেয়েরা নির্মলের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ধুলোয় লুটিয়ে বুক চাপড়ে হাহাকার করে কেঁদেছিল। হুল আর উলগুলানের প্রেমিক হয়েছিল নির্মল তাই সোনারী, উলিয়ান, কদমার মেয়েদের চোখের জলে সেদিন বান ডেকেছিল। নোনা জলের বান।

বিদ্রোহী ঝাড়খন্ড

বিদ্রোহী ঝাড়খন্ডের বীরগাথা নির্মলকে প্রেরণা জোগায়। ঝাড়খন্ডের হাজার হাজার বীর শহীদ যেন তাকে অলক্ষ্যে থেকে বলে, এগিয়ে যাও নির্মল, এগিয়ে যাও লড়াই কর। জীবনের আরেক নাম সংগ্রাম। মানুষ একবারই মরে, মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে হাজারবার মরার চেয়ে সিধু-কানুর মত, বীরসা মুন্ডার মত, যীশুর মত একবার মরা অনেক ভাল। তুমি যীশু হও, সিধু কানু হও বীরসা মুন্ডা হও, ঝাড়খন্ডী আদিবাসীদের লড়াই করতে শেখাও, লড়াই করে মরতে শেখাও, লড়াই করে বাঁচতে শেখাও। বীর ঝাড়খন্ডীদের লড়াই-এর পরম্পরা বাঁচিয়ে রাখতে সংগ্রামের ঝান্ডা ধরে এগিয়ে যাও।

মনে রেখো এই ঝাড়খন্ডেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছিল। ১৭৬০ সালে মেদিনীপুর এল ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে। কোম্পানী আর জমিদারদের অত্যাচারে জর্জরিত, বিধ্বস্ত আদিবাসী খাড়িয়া আর সাঁওতালরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল, চলল কয়েক বছর। কোম্পানী কড়া হাতে দমন করল সেই

বিদ্রোহ। এরপর হাতিয়ার তুলে নিল চুয়াড়রা। ১৭৬০ সালে কোম্পানী সিদ্ধান্ত নিল মেদিনীপুরের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জঙ্গলমহলে সৈন্য পাঠিয়ে জমিদারদের, কোম্পানীকে খাজনা দিতে বাধ্য করা হোক এবং জমিদারদের দুর্গগুলি ধ্বংস করা হোক।

এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা জঙ্গলমহলের প্রায় একশ মাইল এলাকা জুড়ে জ্বলে উঠল বিদ্রোহের আগুন। রামগড়, লালগড়, জামবনী, ঝালদার জমিদার পর্যুদস্ত হল কিন্তু ঘাটশিলার চুয়াড়রা ধলভূমগড়ের জমিদারের সমর্থন পুষ্ট হয়ে ১৭৬৭ সাল থেকে ১৭৭২ সাল পর্যন্ত লাগাতার সংগ্রাম চালিয়ে গেল। ১৭৯৮-৯৯ সালে আবার চুয়াড় বিদ্রোহ শুরু হল বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরের কিছু এলাকায়। শেষ পর্যন্ত এমন কোন এলাকা বাকি রইল না যেখানে বিদ্রোহ হল না। ১৭৯৮ সালে মেদিনীপুরের চুয়াড় জমিদার এবং তাদের পাইকদের সঙ্গে উড়িষ্যার পাইকরা যোগ দিল। ইংরেজরা বুঝল কেবলমাত্র সৈন্য দিয়ে বিদ্রোহ দমন করা যাবে না। তারা পাইক এবং জমিদারদের জমি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হল। কিন্তু তবুও মেদিনীপুর শান্ত হল না ১৮০৬ থেকে ১৮১৬ সাল পর্যন্ত আরও দশবছর বিদ্রোহ স্থায়ী হল।

সিংভূম-এর হো আদিবাসী বহুল এলাকায় হো'রা বিদ্রোহ করল ১৮২০ থেকে ১৮২৭ সাল পর্যন্ত। ১৮২০ তে ইংরেজরা সিংভূমের শাসনভার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল পোড়াহাটের রাজার আত্মসমর্পনের জন্য। রাজা এর জন্য ১০১ টাকা বাৎসরিক খাজনা দিতে রাজী হল। শর্ত ছিল ইংরেজরা খরসোঁয়া এবং সেরাইকেলার সামন্তদের পোড়াহাটের অধীনস্থ করবে এবং হোদের দমন করবে। প্রথম শর্ত না মানলেও দ্বিতীয় শর্ত মেনে নিল ইংরেজরা। মেজর রওসেজের উপর ভার পড়ল হো'দের দমন করার।

মেজর রোওসেজ এবং লেফ্‌টন্যান্ট মেটল্যান্ড হোদের দমন করার জন্য এগিয়ে গেলেন। গোলাবারুদ, বন্দুকের জবাব দিল হো'রা তীর ধনুক দিয়ে। মেজর রোওসেজ এবং লেফ্‌টন্যান্ট মেটল্যান্ড হো'দের গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে অত্যাচার চালালেন। উত্তরাঞ্চলের বিদ্রোহীরা কিছুদিন পরে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হোল। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্রোহ চালিয়ে গেল।

এক দেশী সুবেদার সিপাহীদের নিয়ে কোলহান এলাকায় খাজনা আদায় করতে শুরু করলে তাকে ও সিপাহীদের হো'রা মেরে ফেলল। পরে জঙ্গলের আড়াল থেকে হো'রা বাকি সিপাহীদের উপর আক্রমণ চালায়। এই কাজের পর তারা পোড়াহাটের অধিকাংশ এলাকা দখল করে নেয় এবং সরাইকেলার দিকে এগিয়ে যায়। ১৮২৭ সালে কোম্পানী বিরাট সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে একমাসব্যাপী তীব্র সংঘর্ষের পর হো'রা সরাসরি ইংরেজ-এর প্রজা হয়ে ব্রিটিশ প্রভুত্ব মেনে নেয়।

মুন্ডা, মানকি প্রথা উচ্ছেদ তথা অত্যধিক করদানের বিরুদ্ধে ১৮৩১ সালে কোল বিদ্রোহ শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন রাজাকে এই অঞ্চলের জমিদারী

দিয়ে খুশীমত খাজনা আদায় করতে থাকে। এজন্য আগে থেকেই আদিবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। বিদ্রোহের মুখ্য কারণ ছিল অ-আদিবাসীদের দিয়ে আদিবাসীদের জমি উচ্ছেদ এবং আদিবাসী মেয়েদের উপর অত্যাচার। ছোটনাগপুরের মহারাজার ভাই হরলাল শাহী কিছু আদিবাসীদের জমি ছিনিয়ে নিয়ে নিজের প্রিয়পাত্র অ-আদিবাসীদের দিয়ে দেয়। এরকম বারটি মৌজা ছিল সিংরাই মানকির। সিংরাই মানকির দুই বোনকেও ওরা অপহরণ করে। বন্দগাঁও এর সুরগা মুন্ডার উপর অত্যাচার চালায় ওরা এবং ওর বউকে তুলে নিয়ে আসে। এভাবে অপমানিত হয়ে সিংরাই এবং সুরগা বন্দগাঁওতলা রাঁচী অঞ্চলের আদিবাসীদের ডেকে সভা করে এবং বিদেশীদের খতম করার সিদ্ধান্ত নেয়। সিংরাই এবং সুরগার নেতৃত্বে ৭০০ মুন্ডা সিংরাই-এর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া গ্রামগুলির উপর হামলা চালায়। গ্রাম লুট করে এবং জ্বালিয়ে দেয়। রাঁচী এবং সিংভূমের মুন্ডা এবং হো'রা একসঙ্গে লড়াই এ এগিয়ে আসে। এই বিদ্রোহ দাবানলের মত হাজারিবাগ, পালামৌ, টোরিপরগণা এবং মানভূমের পশ্চিমাংশে ছড়িয়ে পড়ে। কোলদের এই বিদ্রোহ জমিদার এবং বিদেশীদের বিরুদ্ধে যারা আদিবাসীদের জমি ছিনিয়ে নেবার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। বিদ্রোহ দমনের জন্য রামগড় ব্যাটেলিয়ান, কামান বন্দুক নিয়ে পদাতিক এবং ঘোড়সওয়ার সৈনিক, দানাপুর, ব্যারাকপুর, বারানসী এবং বেঙ্গল থেকে পাঠানো হল। দুমাস ধরে যুদ্ধে বহু কোলবিদ্রোহী শহীদ হল যাদের মধ্যে কোলদের নেতা বুদ্ধো ভগতও ছিল। কোল বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রায় ৫০০০ বর্গমাইল এলাকা ইংরেজ সৈন্যরা শ্মশান করে দিয়েছিল। বিদ্রোহীদের নেতা সুরগা এবং সিঁগরাই এর ভাই শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা বুঝেছিল, কোল আদিবাসীদের অ-আদিবাসী জমিদারদের অধীনে রাখা যাবে না। সেজন্য ইংরেজরা সরাসরি আদিবাসীদের শাসনভার গ্রহণ করে। পোড়াহাট, সরাইকেলা এবং খরসোঁয়ার সামন্তদের হাত থেকে ২৩ পীড় (১ পীড় মানে ৭ থেকে ১২টি গ্রাম) এবং ময়ূরভঞ্জ থেকে চার পীড় নিয়ে—কোলদের জন্য আলাদা অঞ্চল নিয়ে কোলহান ক্ষেত্রের শাসনভার দেওয়া হয় একজন ইংরেজ অফিসারকে যার সদর দপ্তর হয় চাইবাসা। বিলকন্‌সন্ রুল মহান কোল বিদ্রোহের ফসল। কোলহানের পরম্পরাগত মুন্ডা-মানকি শাসন মেনে নিতে হয় ইংরেজদের।

ঝাড়খন্ডের আদিবাসীদের দুটি মহাবিদ্রোহ সাঁওতালী হুল এবং বিরসা মুন্ডার উলগুলান শুধুমাত্র বিদ্রোহই ছিল না ছিল বৈপ্লবিক আন্দোলন। সাঁওতাল বিদ্রোহের পিছনে ছিল জমির উপর একছত্র অধিকার স্থাপনের আকাঙ্খা, স্বাধীনতার স্পর্ধা। এজন্য সাঁওতালরা আওয়াজ তুলেছিল, "নিজ নিজ দলপতির অধীনে সাঁওতাল রাজ্য স্থাপন কর।"

অন্যদিকে সাঁওতালদের উপর মহাজনদের ব্যবসার লোভ এবং লুঠতরাজ চালানোর প্রবৃত্তি, ঋণের জন্য ব্যক্তিগত তথা বংশ পরম্পরায় দাসত্ব করার বর্বরপ্রথা

এসবের ফলশ্রুতি হিসেবে সাঁওতালদের দুর্দশা। পুলিশের জুলুম, অত্যাচার, পুলিশ কর্তৃক মহাজনদের দালালি এবং আদালতে সুবিচার না পাওয়ার জন্য ১৮৫৫-৫৬ সালে ইংরেজের বিরুদ্ধে তথা জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হল সাঁওতাল বিদ্রোহ। সাঁওতাল বিদ্রোহীরা চাইল, জুলুম, অত্যাচার, শোষণের অবসান ঘটিয়ে সুখী সাঁওতাল রাজ্যের পত্তন ঘটাতে।

এইসময় ভারতবর্ষে প্রথম রেললাইন চালু হয়। রেল লাইন বসানোর কাজে নিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারীরা সাঁওতালদের হাঁস, মুরগী, ছাগল জোর করে তুলে নিয়ে যেত। মেয়েদের তুলে নিয়ে যেত, ওদের উপর অত্যাচার করে হত্যা করত। এরকম অন্যায়ের জুলুমের কোন ন্যায়বিচার সাঁওতালরা পেত না। ১৮১১, ১৮২০, ১৮৩১ সালে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ওরা এবং শেষ পর্যন্ত একতার প্রতীক 'শারজম্ ডারওয়া' গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়ে ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন ভাগনাডিহি গ্রামে সকলকে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ পাঠায়।

সেই রাত্রে প্রায় ৪০০ গ্রামের দশ হাজারের বেশি সাঁওতাল ভাগনাডিহিতে জমা হয়। ভাগনাডিহি ছিল সিধু, কানু, চাঁদ, ভৈরবের জন্মস্থান। সভায় সাঁওতালরা শপথ নেয় জমিদার, মহাজন এবং ইংরেজের জুলুম তারা বরদাস্ত করবে না। সভা কমিশনার, কালেক্টার, ম্যাজিস্টেট তথা দিঘী এবং টিকড়ি থানার দারোগা এবং কিছু জমিদারের কাছে চিঠি পাঠিয়ে আল্টিমেটম্ দেয়। এর পরে স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য কায়েম করার কথা ঘোষণা করে ওরা। ওরা দাবী করে কুমহার, তেলি, লোহার, জোলা, চামার ইত্যাদিরা ওদের সমর্থনে আছে। পাঁচটি বাজারে পাঁচজন মহাজনকে হত্যা করে বিদ্রোহের সূচনা হয়। এই সময় দীঘি থানার দারোগা সিধু, কানু ইত্যাদিকে গ্রেপ্তার করতে এলে সাঁওতালরা দারোগা এবং সিপাহীদের বেঁধে গণআদালতে বিচার করে। দারোগা এবং নজন সিপাহীকে তারা হত্যা করে।

এইভাবে ১৮৫৫ সালের ৭ই জুলাই বিদ্রোহ শুরু হয়। তারা, ইংরেজ, জমিদার এবং মহাজনদের রাজত্ব উচ্ছেদের জন্য কলকাতা অভিযান শুরু করে। এই অভিযানে নেতাদের অঙ্গরক্ষক হিসেবে ত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল। ইংরেজেদের অনেক কেন্দ্র এবং নীলকুঠী লুণ্ঠিত হয়। বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য ১৫০০০ সুসজ্জিত সৈন্য মজুত করা হয়। কামান, বন্দুক, হাতি ইত্যাদি আনা হয়। অন্যদিকে সাঁওতালদের হাতে ছিল তীর, ধনুক, বর্শা, টাঙ্গি, কুঠার। ইংরেজ সৈন্য বিভিন্ন স্থানে পরাজিত হয়। বিদ্রোহীরা বীরভূম জেলার অর্ধেক এলাকা কব্জা করে নেয়। চাঁদ এবং ভৈরব ভাগলপুরের কাছে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে মারা যায়। এই অসম যুদ্ধ যুদ্ধ ছিল না ছিল গণহত্যার নামান্তর। জঙ্গলের মধ্যে যেখানেই ধোঁয়া উঠতে দেখা যায় ইংরেজ সৈন্যরা ঘেরাও করে চারদিক থেকে। এইভাবে একটি গ্রামে একটি বাড়িকে ঘেরাও করে গুলি চালায় সৈন্যরা। ভেতর থেকে তীর আসতে থাকে কিছুক্ষণ পরে তীর আসা বন্ধ হলে সৈন্যরা ভেতরে ঢুকে দেখে চারদিকে পড়ে আছে বিদ্রোহীদের রক্তাক্ত

মৃতদেহ, এক বৃদ্ধ তখনও দাঁড়িয়ে রক্তাক্ত অবস্থায়। একজন সিপাহী ওকে অস্ত্র ত্যাগ করতে বলে। বৃদ্ধ বিদ্রোহী সঙ্গে সঙ্গে টাঙ্গি দিয়ে সিপাহীর শিরচ্ছেদ করে। অসম যুদ্ধে সাঁওতালরা মারা যায় পতঙ্গের মত। সিধু কানুরা শহীদ হয়। আদালতে ২৫১ জনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয়। এদের মধ্যে ১৯১ জন সাঁওতাল বাকি, ডোম, ঘাঁগর, গোয়ালা, ভুঁইয়া ইত্যাদি। এরমধ্যে ৪৬ জন ন'দশ বছরের বালকও ছিল।

সাঁওতাল বিদ্রোহের ফলশ্রুতি হিসেবে স্থাপিত হয়—সাঁওতাল পরগণা। ইংরেজ মিশনারী ছাড়া অন্যদের সাঁওতাল পরগণায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু সাঁওতালরাজ কায়েম করার জন্য পুনরায় ১৮৭১ এবং ১৮৮০-৮১ সালে আবার বিদ্রোহ হয়।

১৮৯৫ সালে শুরু হয় বীরসা মুন্ডার আন্দোলন। মুলতঃ আদিবাসীদের অরণ্যের অধিকার কায়েম রাখার জন্য। জমি জমা সব হারিয়ে জঙ্গল নির্ভর আদিবাসীদের হাত থেকে ইংরেজ সরকার ছিনিয়ে নিল জঙ্গল। সরদারী লড়াই চলল ১৫ বছর কিন্তু ফল হল না কিছুই। এরপর বিরসা মুন্ডা চাইল শোষণ, অত্যাচার এবং গোলামী থেকে মুক্তি। শুধুমাত্র আর্থিক দিক থেকে নয়, সামাজিক, সংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সমস্ত দিক থেকে মুক্তি চাইল বিরসা। সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি নিল। ১৮৯৯ সালে এঁগলিংকন মিশন এবং ক্যাথলিক চার্চের উপর সশস্ত্র হামলা শুরু হল। ১৯০০ সালের ৫ই জানুয়ারী থেকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

বীরসার নেতৃত্বে মুন্ডারা সব বিদ্রোহ ঘোষণা করল। প্রাণ দিল অগণিত মুন্ডা ছেলেমেয়ে। বুকের লালরক্ত ভিজিয়ে দিল মাটি। বিরসা ধরা পড়ল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী বিরসা ধরা পড়ল এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন জেলখানার ভিতরে বিরসার মৃত্যু হল। শেষ হয়ে গেল বিরসার জমি, জঙ্গল এবং স্বাধীনতার লড়াই। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হল ছোটনাগপুর টেনেন্সি এ্যাক্ট চালু করতে, যাতে বিরসা মুন্ডার মত আন্দোলনের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

এমনি করে অনেক বুকের রক্ত ঝরিয়ে ঝাড়খন্ডী আদিবাসীরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছে তার ইতিহাস, সঠিকভাবে কোনদিন লেখা হবে কিনা নির্মল জানে না। তখন ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই, ইংরেজ শাসকদের দালাল, মহাজনদের বিরুদ্ধে লড়াই। অনেক রক্ত ঝরিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। ইংরেজ ছেড়ে চলে গেল দেশ থেকে। কিন্তু শোষণের, নির্যাতনের, জুলুমের পরম্পরা থেকে মুক্তি পেল না ঝাড়খন্ডী আদিবাসীরা। স্বাধীন ভারতে শোষণের জাঁতাকলটা, নির্যাতনের ফাঁসটা যেন আরো জোরে চেপে বসল ঝাড়খন্ডীদের গলায়।

নির্মল কবিতা লেখেনা, মুখে বলার চাইতে, কাগজে লেখার চাইতে দুহাতে কাজ করতে নির্মলের অনেক ভাল লাগে। তবু ১৯৮৬ সালে গামারিয়ায় যখন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করল বিশালভাবে, তখন একটা কবিতা লিখল। লিখল ঝাড়খন্ডী শহীদদের উদ্দেশ্যে, সিধু কানু, বিরসা মুন্ডার উদ্দেশ্যে।

ঝাড়খন্ড কে মহান দেশভক্ত
বীর সেনানী বীর সন্তান।
দেশহীত কে লিএ স্বেচ্ছা মে
অপনা জীবন কিয়া কুর্বান।
মৃত্যু তুমহারে লিএ খিলোনা
সবসে বড়া দেশ থা অপনা।
আজ দেশবাসী পুকারতে তুম্হে
করতে হ্যায় প্রেম সে আহ্বান।
ঝাড়খন্ডকে বীর সেনানী
আজ তুমহে কোটি প্রণাম।
ধন্য ধন্য য়হ ভারতভূমি হ্যায়
বীরসা কো জন্ম দিয়া
অঁগ্রেজোঁ কে খিলাফ্ জিন্হোনে
হাথ মে হাথিয়ার উঠা লিয়া।
ক্যায়া উন্হে আজ ভুল যায়েঙ্গে?
ভুল যায়েঙ্গে ক্যায়া উন্‌কে দান?
জন্মভূমি কা উস্‌দুর্দিন মে
রক্ষা কিয়া জো জাতিকা মান।
সিধু কানুওঁ কি অমর কহানি
ইয়াদ করনে কা দিন হ্যায় আজ—
কৌন, নেহি জানতে হ্যাঁয় উন্হে
কৌন নেহি শুনা আওয়াজ!
সহিদোঁ কা আত্মা পুকার রহি হ্যায়
জাগো, উঠো সব বীর জওয়ান
রক্ষা করো হরহাল্‌মে দেশ কি ইজ্জত্
অপনা গৌরব মান-সম্মান।

কবিতা যেদিন প্রকাশিত হয় সেদিন অনেকেই এটাকে একটা মামুলি কবিতা হিসেবে মনে করেছিল। কিন্তু নির্মল যে সিধু, কানু, বীরসার আত্মার ডাক শুনে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে এটা সেদিন কেউ ভাবতে পারেনি। ভাবতে পারেনি, নির্মলের উত্তরসুরীরা কেও এমনি করে আজ চোখের জলে শহীদ নির্মলকে নিয়ে কবিতা লিখতে হবে।

শহীদ নির্মল নির্মল মাহাত
ঝাড়খন্ডী হুল।
উলগুলান আর সাঁওতালী হুলতঞ

ঝাড়খন্ডীক মূল।
লহুক বদলে দেবও তকে
লহুকেরি ফুল।
তহর মরণ ঝাড়খন্ডীক
ছতিয়াকর সুল।

সিধু, কানু, বিরসার উত্তরসূরীরা

পরাধীন ভারতবর্ষে, সিধু, কানুরা, বিরসারা হো'রা, কোলরা, ওঁরাওরা ইংরেজের বিরুদ্ধে, মহাজনের বিরুদ্ধে, দালালদের বিরুদ্ধে জমি রক্ষার জন্য, জঙ্গলের অধিকার কায়েম রাখার জন্য, ধর্ম, সংস্কৃতি, মেয়েদের সম্মান রক্ষার জন্য আন্দোলন করল, লড়াই করল, প্রাণ দিল। সাঁওতালদের জন্য, হো দের জন্য, ওঁরাওদের জন্য, কোলদের জন্য, মুন্ডাদের জন্য চাইল আলাদা আলাদা ভূমি। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে ওদের জন্য আলাদা আলাদা ভূমি নয়, সবার জন্য আলাদা একখন্ড ভূমি চাইল ঝাড়খন্ড পার্টি। ঝাড়খন্ড পার্টির নেতা জয়পাল সিং। মেদিনীপুর, থেকে রাঁচী, সাঁওতাল পরগণা থেকে কোলহান, ময়ূরভঞ্জ, কেঁওঝর, সুন্দরগড় সম্বলপুর, রায়গড়, সরগুজায়, উঁচু-নীচু পাহাড়ী জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি নিয়ে একই সংস্কৃতির দাবিতে, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশে ভাগ করে দেওয়া ছোটনাগপুর, সাঁওতালপরগণার মালভূমির ইতিহাস নিয়ে একখন্ড ঐতিহাসিক ঝাড়খন্ড চাইল জয়পাল সিং, এন.ই.হোরো, বাগুন সোমরাইরা যা ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যেই আলাদা রাজ্য হিসেবে এখানকার পিছিয়ে পড়া আদিবাসীদের বিকাশের জন্য উদ্যোগ নেবে।

স্বাধীন ভারতের নটি রাজ্য ক্রমে ভাগ হতে হতে ২৫টি রাজ্যে বিভক্ত হল কিন্তু ঝাড়খন্ড আলাদা রাজ্য হল না। আদিবাসীদের নেতা হয়ে জয়পাল সিংরা বিকিয়ে দিল নিজেদের মন্ত্রীত্বের লোভে আত্মপ্রতিষ্ঠার লোভে। ঝাড়খন্ডীদের সঙ্গে ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করল। জয়পাল সিং, জাহানারা, বাগুন সোমরাইরা কংগ্রেসে যোগ দিয়ে মন্ত্রী হলেন। আদিবাসীরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল। ওরা বরং এদের শোষণমুক্তির লড়াই-এ ঢেলে দিল ঠান্ডা জল।

এন.ই.হোরোরা টিম্ টিম্ করে জ্বালিয়ে রাখল আন্দোলন, এরপর বিনোদ বিহারী মাহাতো, শিবু সোরেনরা, এ.কে.রায়রা ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা তৈরি করল। আন্দোলন আরও জোরদার হল। অনেকে ভোটে জিতে এম.এল.এ. হোল, এম.পি. হোল। এম.এল.এ হয়েছিল জয়পাল সিং এর সময়েই সবচেয়ে বেশি ৩৯ জন। বিহার বিধানসভায় বিরোধী দল ছিল তখন ঝাড়খন্ড দল। কিন্তু আলাদা রাজ্য!

আলাদা রাজ্য হওয়ার স্বপক্ষে কোন আশার আলো দেখতে পায়না নির্মল! নেতৃত্বের লড়াই-এ, নীতি নৈতিকতার কচকচিতে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চাও দুর্বল হয়ে পড়ল। বিক্ষুব্ধ ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা তৈরি হল। ঝাড়খন্ড নাম নিয়ে অনেক দল

তৈরি হল। এই বিপর্যয়ের মাঝে বিনোদবিহারী মাহাতকে সরিয়ে নির্মলকেই ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার সভাপতি করা হল। আন্দোলন থিতিয়ে গেল। নির্মল ভেবে পায়না কিভাবে ঝাড়খন্ড আলাদা রাজ্য হবে। একথা কজন চিন্তা করে নির্মল তাও ঠিক বুঝতে পারে না। এ দোষ দেয় ওর নামে ও দোষারোপ করে এর নামে। নেতাদের খেয়োখেয়িতে আন্দোলন মাঠে মারা যায়।

শিবু সোরেনরা কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করে ভোটে জিতেছিল এজন্য বিক্ষুব্ধরা বা অন্যান্যরা মুক্তি মোর্চাকে কংগ্রেসের দালাল বলে। মুক্তি মোর্চা অন্যদের বলে সি.পি.এমের দালাল বা অন্য কারুর দালাল। আসলে স্বাধীনতা পরবর্তী ঝাড়খন্ড আন্দোলনের আন্দোলন এবং রাজনীতিকে এক করে ফেলা হয়েছে। সিধু কানুরা বিরসারা লড়াই করেছিল, আন্দোলন করেছিল, রাজনীতি করেনি। বর্তমানে সবাই রাজনীতির জালে জড়িয়ে নাকানি চোবানি খাচ্ছে। কেউ সিধু কানু হতে চাইছেনা, বীরসা মুন্ডা হতে চাইছেনা। সবাই চাইছে ভোটে জিতে এম.এল.এ হতে, এম.পি.হতে।

নির্মলও ভোটে দাঁড়িয়েছে একবার, দুবার, তিন বার সববারই হেরেছে। হেরে গিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে ও। জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ভয়টা ওর দূরে সরে যায় ভোটে হারলে। নির্মল কাজ করে দুহাতে কাজ করে। দরীদ্র, মেহনতী মানুষদের শোষণ, উৎপীড়ন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য রাত দিন পরিশ্রম করে। নির্মল কখনও কখনও নিজেকেই প্রশ্ন করে তাতেই কি ঝাড়খন্ড হবে? একটাই উত্তর উঠে আসে, চাই মজবুত সংগঠন, জোরদার জনমত। নির্মল তাই কাজ করে, রাতদিন পরিশ্রম করে। কতজন স্থানীয় ছেলের চাকরী দিতে পেরেছে, কতজন লোককে জমির তিরিশ টাকা একর কমপ্যানসেশানে তিন হাজার টাকা দিতে পেরেছে, তারও যেমন হিসেব করে নির্মল তেমনি হিসেব করে সংগঠন কতটা মজবুত হোল। কিভাবে এখনাকার মানুষদের একত্রিত করে আন্দোলনে নিয়ে আসা যায় এই চিন্তায় বুঁদ হয়ে থাকে নির্মল। রাজনীতির কচ-কচানিতে নিজেকে কখনই জড়াতে চায় না ও।

ঝাড়খন্ডী আদিবাসীদের একসূত্রে গ্রথিত করার জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে এগিয়ে দিতে চায় ও। সেবার বিদ্যাভূষণ বাবুরা, প্রফুল্লবাবুরা, বিজয় কিশোররা, যখন জামশেদপুরের বুকে বিশাল আকারে ছোটনাগপুর উৎসব করলেন কুড়মি সাঁওতাল মুন্ডা ওঁরাও, হো, খাড়িয়া সবকটি আদিবাসী গোষ্ঠী যখন একসঙ্গে, ছো, করম, পাঁতা, দাঁসাই, সহরই, বাঁদনা নাচে অংশগ্রহণ করল নির্মল সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তদারকি করত অনুষ্ঠানের। এরকম অনুষ্ঠান আরও যাতে বার বার হয় তার জন্য ছেলেদের উৎসাহিত করত। ১৯৮৬ সালে নিজেই উদ্যোগী হয়ে গামারিয়াতে বিরাট আকারে করল ছোটনাগপুর মহোৎসব। ঝাড়খন্ডের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের আমন্ত্রিত করে ঝাড়খন্ড রত্ন, ঝাড়খন্ডশ্রী উপাধী ভূষিত করল।

নির্মল নাটকের দল গড়ত, নাটকের মাধ্যমে, প্রতিবাদী নাটকের মাধ্যমে গণচেতনা বিকাশের জন্য। ছৌ নাচ, পাঁতা নাচ, ঝুমুর গানে মানুষের চেতনা বিকাশের

জন্য জনসাধারণকে আন্দোলনমুখী করার জন্য শিল্পীদের উৎসাহ দিত। নির্মল ভাবত শুধুমাত্র শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন নয়, সাংস্কৃতিক কাজকর্মও আন্দোলনের একটা বিরাট হাতিয়ার। নির্মল ভাবত শুধুমাত্র নেতাদের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকলে চলবে না, নেতা হয়ে থাকার কথা ভাবলে চলবে না। আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে দুর্বার গতিতে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই আন্দোলনে বারবার ধ্বস নামছে এটা নির্মল বুঝতে পেরেছিল তাই সে নেতা হয়েও নেতা হতে চাইল না। হতে চাইল একনিষ্ঠ কর্মী। যার জন্য নির্মল সমস্ত নেতাকে ছাড়িয়ে অনেক ওপরে চলে গেল, চলে গেল সবার নাগালের বাইরে।

সুবর্ণরেখার সোনা

রাঁচীর নগরা গ্রাম থেকে পাহাড়ী ঝর্ণা ধীরে ধীরে হয়ে গেছে সুবর্ণরেখা। সুবর্ণরেখা মানভূম সিংভূম হয়ে ঝাড়গ্রাম বালেশ্বর হয়ে মিশে গেছে বঙ্গোপসাগরে। সুবর্ণরেখাকে নিয়ে কতজন কত গান বেঁধেছে। সুবর্ণরেখার তীরে তীরে কত প্রেম অপ্রেমের, মিলন বিরহের, সুখ দুঃখের স্মৃতি। লক্ষ লক্ষ মেয়ের জাওয়ার ডালি, রঙ বেরঙের চৌডল, প্রেমিক প্রেমিকার বন ফুলের মালা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সুবর্ণরেখা। যুগ-যুগান্তরের ভাঙা গড়ার সাক্ষী সুবর্ণরেখা। সুবর্ণরেখার তীরে তীরে মানব সভ্যতার ইতিহাস। সুবর্ণরেখাকে নিয়ে পশুপতি মাহাত, কৃত্তিবাস কর্মকার ভবতোষ সৎপথী, বিজয় মাহাত ইত্যাদি অনেকেই গান লিখেছে।

নাম না জানা লোক কবি লিখেছে ভাচাকুটা মেয়ের জীবনের চিত্র, রোদপানি, রাইত কানা, কেইসনে শুখাঅম টেনা, সুবর্ণরেখায় সিনান করি রে ভুথি, কেতিখন ছুটি।" ভাগাবাঁধের ডাঃ মনোরঞ্জন বাবু লিখেছেন, "সুবর্ণরেখা নদীর নাম, কাতাধারে কত গ্রাম হামরা গড়িলি কত গ্রাম।" সুবর্ণরেখার বালিতে পাওয়া যায় সোনার কণা। অনেকেই বালি চেলে চেলে বের করে বাজারে বিক্রি করে সোনা। খুব কম হলেও মজুরী উঠে যায় তাতে। তা নিয়েই তারা স্বপ্ন দেখে, ছোট আশা, ছোট ছোট স্বপ্ন কিন্তু বড় মধুর সেই স্বপ্নের ছোঁয়া—

সুবন্নখা নদীঞ, সনা পাইঅ জদি
বিছিবিনি গঅ নদি কিনারাঞ
জিনগানি গঅ হামে দেবও বিতাই।
চালইনে চালি মুঠা মুঠা বালি
সনা কনাঞ গঅ গহনা গঅ
গুণমনি গঅ তকে দেবও গড়হাই।
জনম পিরিতি মরণ পিরিতি
হাঁসি হাঁসি গঅ প্রেম ফাঁসি গঅ

প্রেমধনি গঅ তকে দেবও পিঁধাই।
কহত সুনিলে জতেক বনফুলে
হালা হালা গঅ ফুলমালাঞ গঅ
সজনি গঅ তকে দেবও সাজাই।

কিন্তু সুবর্ণরেখাকে নিয়ে এই সুখ স্মৃতি সিংভূমের মানুষের কাছে বেশী দিন আর রইল না। সুবর্ণরেখা নদীতে বিশাল নদীবাঁধের পরিকল্পনা করা হল, সুবর্ণরেখা প্রজেক্ট। কুমারী, দুলমি, পাতরাহাতু, তামাড়, ইচাগড়, গাঁগুড়ি, মঝগাঁ, বারহি, দেহরিডিহ, বাঁদু, রুসানি, ভালকি, লেপাটাঁড়, ইচা, আদারডি, ডিমুডিহ, কেশগড়িয়া, বাঁদা, আয়তা, বিরডি, মধুপুর, গোপালপুর ইত্যাদি আশিটি মৌজা চলে যাবে নদী বাঁধে জলের তলায়। ক্ষতিগ্রস্ত হবে গোটা সিংভূম এলাকা।

লোহরা, সর্দার, মাঝি, ওঁরাও, তিবু, মুন্ডা, গোপ, কুড়মি, সাহু, ঘাটোয়ার গরাঞ ইত্যাদি জাতিধর্ম নির্বিশেষে আশিটি গ্রাম থেকে উৎখাত হবে হাজার হাজার মানুষ। গোটা সিংভূম এলাকার লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীর চাষের জমি যাবে জলের তলায়। নদীবাঁধের আলে, ক্যানেলে। ডুবে যাবে ঐতিহাসিক নিদর্শন, ডুবে যাবে, সুবর্ণরেখার সোনার উৎস।

আশিটি গ্রামের লক্ষাধিক মানুষ কোথায় যাবে কেউ তা বলে দেবে না। নামমাত্র ক্ষতিপূরণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে জমিজমা পিতৃপিতামহের ভিটা মাটি। ঐ সামান্য ক্ষতিপূরণের টাকায় আর কোথাও জমি কিনতে পারবে না তারা। আদিত্যপুরের ৪৫০ ক্ষুদ্রশিল্পের অধিকৃত জমির ক্ষতিপূরণের রেট তিরিশ টাকা একর থেকে তিন হাজার টাকায় তুলে এনেছিল নির্মল আন্দোলন করে। উৎখাত হয়ে যাওয়া লোকদের অনেকের চাকরি দেওয়াতে সক্ষম হয়েছিল নির্মল ঐ ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতে, টেলকো, টিসকোর কারখানায়। চান্ডিলের ইচাগড়েও ঝাঁপিয়ে পড়ল নির্মল। ঝাঁপিয়ে পড়ল সুবর্ণরেখা প্রজেক্টে উৎখাত হওয়া হাজার হাজার গ্রামবাসীর স্বপক্ষে। ক্রান্তিকারী যুবছাত্র মোর্চার ছাত্ররা এগিয়ে এল তার সঙ্গে। এগিয়ে এল উৎখাত হওয়া হাজার হাজার মানুষ।

নির্মল দাবী করল উৎখাত হয়ে যাওয়া লোকদের জমির উপযুক্ত মূল্য অথবা পুনর্বাসন। উৎখাত হওয়া লোকদের সুবর্ণরেখা প্রজেক্টের চাকরিতে প্রাথমিকতা ইত্যাদি। জমির ক্ষতিপূরণ নিয়ে দালালি বন্ধ করল নির্মল। তা নইলে ক্ষতিপুরণের টাকার বেশীরভাগ যায় দালাল এবং অফিসারদের পকেটে। জমিজমা ঘরবাড়ি হারিয়ে শেষ পর্যন্ত কিছুই পায়না গ্রামবাসীরা।

অতঃপর এল ঠিকাদার শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরীর দাবী। পেটের জ্বালায় পাথর ভাঙে শ্রমিকরা। মেয়ে পুরুষ শীত গ্রীষ্ম বর্ষাকে উপেক্ষা করে কাজ করে দিনরাত কিন্তু মজুরী পায় ৫-৬ টাকা। নির্মলের নূন্যতম মজুরী ১৫ টাকা মেনে নিতে বাধ্য হয় ঠিকাদাররা। আদিবাসী মেয়েদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ায় নির্মলরা।

ঠিকাদারদের বেঁধে শ্রমিকদের গণ আদালতে বিচার করে নির্মল। নির্মল হয়ে ওঠে ঠিকাদার, মুনাফাখোর শোষক, রাজনীতির দালালদের চোখের বালি পথের কাঁটা। তাছাড়া অন্যান্য দলের রাজনৈতিক কারবারও প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয় নির্মলের দুর্ধর্ষ ক্রীয়াকলাপের জন্য, সুতরাং ওকে ইহজগত থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য অলক্ষ্য থেকে বোনা হতে থাকে সুপরিকল্পিত যড়যন্ত্রের জাল।

চান্ডিলের স্টিল স্পঞ্জ কারখানায় উৎখাত হয় বাইশটি মৌজা। নির্মল দাবী করে উৎখাত হওয়া লোকদের জমির ন্যায্য মূল্য পুনর্বাসন এবং চাকরিতে অগ্রাধিকার। ঐ বাইশটি মৌজার লোকদের চাকরি হওয়ার পরে সিংভূম-এর স্থানীয় লোকদের চাকুরী হবে। তারপরে হবে স্থানীয় ঝাড়খন্ডীদের যারা ঝাড়খন্ডের আদিবাসীন্দা। ইঞ্জিনিয়ার অন্যান্য টেকনিক্যাল হ্যান্ড যখন এই এলাকায় পাওয়া যাবে না তখন আনা যাবে বাইরে থেকে।

কারখানা হবে ঝাড়খন্ডে, উৎখাত হবে ঝাড়খন্ডের লক্ষ লক্ষ মানুষ। নিয়োগ হবে কোলকাতা, পাটনা, ভুবনেশ্বর থেকে। চাকরি পাবে ওরাই, উৎপাদনের অমৃতের অধিকারী হবে অন্য লোক আর ঝাড়খন্ডীরা তা চেয়ে চেয়ে দেখবে, চিমনির ধোঁয়ায় পেট ভরাবে। গতানুগতিক এই নিয়মটাকে ভাঙতে চাইল নির্মল।

সুতরাং চক্রান্তের জাল বোনা হতে থাকলো নির্মলের বিরুদ্ধে। একদিকে নির্মল হয়ে উঠল অত্যাচারিতদের, নিপিড়ীত, মেহনতী মানুষদের ভগবানের দূত, অন্যদিকে, শোষক, শাসক, মুনাফাখোরদের দুশমন। কিন্তু দুশমনকে ভয় করত না নির্মল। ভয়ভীত হয়ে সতর্ক থাকত না কোন সময়েই। সরল বিশ্বাসে সবাইকেই আপন করে নিতে চাইত। ওর ধারণা ছিল খারাপ লোকও ধীরে ধীরে ভাল হয়ে যায়। সব মানুষের ভিতরেই আছে আর একটা মানুষ, ভাল মানুষ। যে মানুষকে ভালবাসতে চায়। এই বিশ্বাসটাই নির্মলের কাল হয়ে দাঁড়াল, ঠেলে দিল মৃত্যুর দিকে। কয়লা হাজার ধুলেও তার কালো রঙ যায় না, যেতে পারে না। এটা প্রকৃতির নিয়ম, নির্মল এটা ভুলে গিয়েছিল।

সুবর্ণরেখা পরিকল্পনায় ছাত্র আন্দোলন

চান্ডিলের কাছে চৈনপুর, নিমডি ব্লকের ডিয়াডি, বুড়ুহাতুর, সোনাখাদ ময়সরায়, অনেকেই সোনার খোঁজে সারাদিন কাজ করে। নদীর বালি চেলে চেলে সোনা বার করে তারা। পাইকাররা এসে সোনা কিনে নিয়ে যায়। ২০ টাকা লাল। অর্থাৎ এককুঁচ বা একরতির দাম কুড়ি টাকা। সারাদিন কাজ করলে মেলে এক আধ রতি সোনা। মজুরী পুষিয়ে যায় তাতে। দুলমি যাবার বাস রাস্তার গায়ে তামা পাহাড়। লাল মোরাম দিয়ে তৈরি রাস্তা উঠে গেছে পাহাড়ের গায়ে। জায়গায় জায়গায় রাস্তার ধারে সাজানো বোল্ডারের স্ট্যাক। সুবর্ণরেখা বাঁধের জন্য। জলাধার পরিকল্পনার জন্য তিরুলডি আউটার সিগন্যাল থেকে রেললাইন এদেলডি, বাকার কুড়ি, লেটেমদা, জানুম

পলাশডি মুরখিমারি দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। জলাধারে পড়বে পাড়কিডি, দুলমি, ইচাডি, এই তিনটি স্টেশন। ডুবে যাবে স্বর্ণক্ষেত্র। মিশরে আসোয়ান বাঁধ তৈরির সময় পুরাতাত্ত্বিক অমূল্য কিছু নিদর্শন নষ্ট হতে বসেছিল। নিষ্প্রাণ মূর্তি সম্পদের ত্রানকার্যে মিশর সরকারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ইউনেস্কো। কিন্তু লোয়াকে বাঁচাবার লোক নেই।

সুবর্ণরেখা জলাধার প্রকল্পে দুটি বৃহৎ জলাধার নির্মিত হবে। একটি সুবর্ণরেখা নদীর উপর চান্ডিলে, অন্যটি খরখরি নদীর উপর চাইবাসার কাছে ইচাগ্রামে। এছাড়া দুটি অতিরিক্ত জলাধার নির্মিত হবে আদিত্যপুর ও গালুডিতে। চান্ডিল জলাধারে ৩২টি গ্রাম সম্পূর্ণভাবে এবং ৫৭টি গ্রাম আংশিকভাবে ডুবে যাবে। ইচা জলাধারে ১২টি গ্রাম ডুববে এবং ৬০টি গ্রাম আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ১৯৭৮ সালে চান্ডিলের জয়দাগ্রামে বিহার সরকারের জমি অধিগ্রহণ নীতির বিরোধীতা করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন চারজন যুবক।

খরখরি বাঁধ সংঘর্ষ সমিতির সাধারণ সম্পাদক, ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন নায়েক সুবাদার রাম নারায়ণ (গঙ্গারাম) কালুন্ডিয়াকে ৪ঠা এপ্রিল রবিবার তাঁর ইলিগাড়ী গ্রামে গ্রামবাসী, পরিবারের লোকজন, স্ত্রী কন্যার সামনে বিহার পুলিশ নিমর্মভাবে হত্যাকরে। রাষ্ট্রপতি পুরষ্কার প্রাপ্ত, পাকিস্তান যুদ্ধের জন্য ১৯৬৫ সালে সেবাপদক এবং ১৯৭৩ সালে প্রশংসিত হওয়া এই বীর সৈনিককে হত্যা করার পর সিংভূমের জেলাশাসক ডি.এন মিশ্র মৃত কালুন্ডিয়াকে 'একজন ভয়ঙ্কর অপরাধী' বলে অভিহিত করেন।

সুবর্ণরেখা পরিকল্পনার জন্য ব্যয়বরাদ্দ হয় ৪৮০.৯০ কোটি টাকা। টাটানগর সহ সিংভূমের শিল্পাঞ্চলগুলির কোনরূপ ক্ষতি না করে বিভিন্ন খালগুলি নিয়ে যাওয়া হবে। টাটা, মুসাবনী, যাদুগোড়া, ঘাটশিলা অঞ্চলের বৃহৎ শিল্পপতিদের সাহায্যের জন্যই এই জলাধার নির্মিত হচ্ছে।

সুবর্ণরেখা পরিকল্পনায় উদ্বাস্তু হবার আশঙ্কায়, ঐ অঞ্চলের ছাত্ররা, "ক্রান্তিকারী ছাত্র-যুব মোর্চা" নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। সভাপতি শ্রী অশোক ওঁরাও এবং সম্পাদক হিকিম মাহাত। ১৯৮০ সালে এই সংগঠন তৈরি হয়। সুবর্ণরেখা পরিকল্পনায় উৎখাত পরিবারগুলির জন্য ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, জমির বদলে জমি প্রতিটি পরিবারের জন্য একটি করে চাকরি, স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য বিশেষতঃ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পদে নিয়োগের পূর্ণ শর্ত এবং উত্তর বিহার থেকে আগত প্রশাসক ও কর্মচারীদের জুলুম, অত্যাচার, শোষণ থেকে মুক্তির জন্য কার্যতঃ এই সংগঠন গড়ে ওঠে। সরকারী প্রশাসন ও কর্তাদের এই সংগঠনের উপর রাগের কারণ যেহেতু মাত্র ১০ শতাংশ স্থানীয় লোক চাকুরিজীবি এবং এই সংগঠন স্থানীয় যুবকদের ৯০ শতাংশ চাকরির দাবীতে আন্দোলন করছেন। এর ফলে উত্তর বিহার থেকে সরাসরি লোক নিয়োগ করা যাচ্ছিল না। অথচ এই ধরণের পরিকল্পনায় তৃতীয়

ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে এই মর্মে সরকারী আদেশ আছে।

ক্রান্তিকারী যুব-ছাত্র মোর্চার পতাকার ১/৪ অংশ ছিল লাল এবং ৩/৪ অংশ সবুজ। এজন্য বিহার প্রশাসন ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুবছাত্র মোর্চার যোগাযোগ আছে বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল না। অন্যদিকে এই অঞ্চলে 'মাহাত' জনগোষ্ঠীর লোকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার জন্য এই সংগঠনকে 'কুড়মি-মাহাত'দের সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করার কাজেও প্রশাসন সচেষ্ট ছিল।

২১ শে অক্টোবর ১৯৮২ সকাল সোয়া দশটা নাগাদ ক্রান্তিকারী যুবছাত্র মোর্চার কর্মকর্তারা মিঃ মুন্ডা এবং সার্কেল অফিসার মহঃ আসলামের নিকট বিক্ষোভ সংগঠিত করার জন্য অগ্রিম খবর পাঠায়। বিক্ষোভের মোকাবিলা করার জন্য মহঃ আসলাম পুলিশ চৌকির ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীদাসকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। বেলা ১টা নাগাদ প্রায় ছ'শ ছাত্র যুবকের একটি মিছিল সরকারী দপ্তরের সামনে এসে উপস্থিত হয়। বিক্ষোভকারীরা একটি দাবীপত্র শ্রীমুন্ডার হাতে অর্পণ করেন।

দাবীপত্রের অন্যতম দাবী ছিল ইচাগড় অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। ত্রাণকার্যের জন্য দ্রুত ব্যবস্থাগ্রহণ এবং অন্যান্য কিছু স্থানীয় সমস্যার কথাও ছিল দাবীপত্রে। মুন্ডার সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর যুবছাত্র প্রতিনিধিদল যখন সার্কেল অফিসার মহঃ আসলামের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল তখন তিনি দপ্তরের বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে থাকেন। মহঃ আসলামকে দেওয়া দাবীপত্রে দুর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চল ঘোষণা ছাড়াও অভূতপূর্ব খরা জর্জরিত ইচাগড় ব্লকের যৎসামান্য শস্য উৎপাদনের সম্ভাবনাকে সরকারী, বেসরকারী পুকুরগুলির জল দিয়ে বাঁচানোর জন্য অনুমতি প্রার্থনার কথাও ছিল। গ্রাম পঞ্চায়েতে জল-বন্টনের ব্যবস্থা, আরও বেশী রেশন দোকান, দুর্দশাগ্রস্ত ছাত্র যুবকদের আয় ও জাতি প্রমাণপত্র দেওয়ার সত্বর ব্যবস্থা এবং কুকড়ু হাটের তোলা স্কুলের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করার কথা ছিল। আসলাম যুব-ছাত্র প্রতিনিধিদের কথার তেমন গুরুত্ব দেননি করাণ কিছু দাবীর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত ছিল।

ইচাগড়ের রাজার দান "বিক্রমাদিত্য উচ্চবিদ্যালয়ের" উন্নয়নের নিমিত্ত কুকড়ু হাটের তোলা থেকে সাপ্তাহিক মোটা টাকা হজম করতেন মহঃ আসলাম, তোলা আদায়কারী হেডমাষ্টারের মাধ্যমে। জাতি ও আয়ের প্রমাণপত্র দেওয়ার জন্যও ঘুষ নিতেন আসলাম। সুতরাং যুব-ছাত্র মোর্চা এগুলির বিরোধিতা করায় মহঃ আসলাম ক্রান্তিকারী যুব-ছাত্র মোর্চার উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন।

যখন মহঃ আসলাম প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর অধীনস্থ ট্রেজারী গার্ড সরকারী দপ্তর থেকে ২০-২৫ গজ দুরে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। তাঁরা সেখান থেকে যুব-ছাত্র প্রতিনিধিদের এবং আসলামকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। কুকড়ু

হাটের তোলা আদায় সংক্রান্ত ব্যাপারটি নিয়ে প্রতিনিধিদের সঙ্গে আসলামের বিতর্ক বাধে। এরফলে দুরে দাঁড়িয়ে থাকা যুব-ছাত্র কর্মীরা শ্লোগান দিতে থাকে। হঠাৎ মহঃ আসালম "বাঁচাও বাঁচাও গুলি চালাও, গুলি চালাও" বলে চিৎকার করতে থাকেন। পঞ্চায়েত ভবনের পিছনে দাঁড়ানো ট্রেজারী গার্ডরা বারান্দার বাইরে দাঁড়ানো ছাত্রদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়।

ঘটনাস্থলেই নিহত হয় ধনঞ্জয় মাহাত ও অজিত মাহাত। সর্বেশ্বর মাহাত সহ বহু ছাত্র ও যুবক গুরুতরভাবে আহত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করে। যার মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তিনজন মুখিয়া, ইচাগড় সামুদায়িক বিকাশ অঞ্চলের কং (ই) দলের অধ্যক্ষ এবং বিকাশ অঞ্চলের ২০ দফা কর্মসূচী রূপায়ণ সমিতির চেয়ারম্যান গুরুচরণ মাহাতও ছিলেন। পুলিশ এদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি মিথ্যা মামলা দায়ের করে। গুলি চালানোর অপরাধকে ঢাকবার জন্য পুলিশ দমনপীড়নের মাত্রা বাড়াতে থাকে। জেলার ৩২টি সামুদায়িক অঞ্চলের ৩২টি ই ছিল খরা ও দুর্ভিক্ষ কবলিত। জেলাশাসক শ্রীমিশ্র স্বীকার করেছেন খরার ফলে প্রায় ৯ কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়েছে। কিন্তু ক্রান্তিকারী যুব-ছাত্র মোর্চার আন্দোলনের বিরুদ্ধে দমন পীড়ন চালাতে লাগল প্রশাসন।

এরপর ভয়ভীত যুব ছাত্র মোর্চার সহায়তার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্মল। মৃত অজিত, ধনঞ্জয়ের মৃত দেহ নিয়ে শোকমিছিল করে। মৃতদেহ সৎকার করে। ১২ই নভেম্বর ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার সংসদ সদস্য তথা সম্পাদক শিবু সোরেন ও নির্মল মাহাত তিরুলডিতে এক বিশাল জনসমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনা করেন। সর্বদলীয় সংযুক্ত সংঘর্ষ সমিতির ডাকে ২৪ নভেঃ বুন্ডু, তামাড়, সিল্লি, সোনাহাতু ও রাহেতে বারো ঘন্টাব্যাপী বন্ধ সফল হয়।

১৯৮৭ সালের ৮ ই আগষ্ট অবশেষে এল সেই কলংকিত দিনটি, ১৯৮৭ সালের ৮ই আগষ্ট জামশেদপুরের সোনারীতে টাটা আয়রণ এ্যান্ড স্টীল কোম্পানীর চামরীয়া গেষ্ট হাউস থেকে বেরোতে গিয়ে, গেষ্ট হাউসের সিঁড়ির কয়েক গজ দূরে আততায়ীর গুলিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল নির্মল, নির্মল মাহাত, ঝাড়খণ্ডের যীশু। তখন বেলা এগারোটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ঠিকাদার, ব্যবসাদার, পুঁজিপতি, সুদখোর, মহাজন, কল-কারখানার মালিক, রাজনৈতিক নেতা, এমনকি যাদের সঙ্গে এককালে একই সঙ্গে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে যুক্ত ছিল নির্মল তারাও নির্মলের শত্রু হয়ে গেছিল ওর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার দরুণ। তবু নির্মল ছিল বেপরোয়া। তাছাড়া সোনারীর বুকে প্রকাশ্য দিবালোকে তার উপর প্রাণঘাতী হামলা হতে পারে একথা নির্মল কেন জামশেদপুরের জনসাধারণের কাছেও অচিন্তনীয় ছিল।

কিন্তু নির্মলের উপর হামলা হলে তা মামুলি হামলা হবে না, হবে প্রাণঘাতী হামলাই এটা অনেকেরই জানা ছিল। কারণ যে নির্মলের নামে জামশেদপুরের গুন্ডারাজ, মাফিয়ারাজের বুক কেঁপে উঠত, হামলার পর সেই নির্মল বেঁচে গেলে

তার পরিণামের ভাবনাটা হামলাকারীদের ভাবতেই হোত। সেজন্য গুলি করার আগে আততায়ীদের মুখ থেকে শোনা গিয়েছিল শেষ কথা, 'মার দো শালেকো, ছোড় মত্।" গর্জে উঠেছিল খুনীদের পিস্তল, এক, দুই,তিন, পরপর বুলেটের ঘায়ে চামরিয়া গেষ্ট হাউসের সিঁড়ির কাছে আর্তনাদ করে ভুমিশয্যা নিল নির্মল।

"নির্মল মাহাত আততায়ীর গুলিতে নিহত' খবরটা যেন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল জামশেদপুরের বুকে, এমুখ থেকে সে মুখ, এ কান থেকে সে কান হতে হতে খবরটা ছড়িয়ে পড়তে লাগল জামশেদপুর ছাড়িয়ে সিংভূম, মানভূম, রাঁচী, হাজারীবাগ, সাঁওতাল পরগনা, ময়ূরভঞ্জের, কেঁওঝরের গ্রামে গঞ্জে। দুমদাম করে জামশেদপুরের দোকানপাটের ঝাঁপ বন্ধ হতে লাগল। বাস, মিনিবাস, টেম্পো, ট্র্যাক্সি, ট্রাক, মোটর সাইকেল, রিক্সর চাকা থেমে যেতে লাগল। কয়েক ঘন্টার মধ্যে গোটা জামশেদপুর যেন নিঃস্তব্ধ এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হোল।

শুধু নির্মলের মৃত্যুদিন ঐ ৮ই আগষ্টই না জামশেদপুর স্তব্ধ হয়ে রইল পরপর চারদিন। দোকানপাট কেউ খুলল না যানবাহনের চাকা ঘুরল না ঐ চারদিন জামশেদপুরে চলল অঘোষিত বন্ধ।

নির্মলের মৃত্যুর খবরটা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল গোটা ঝাড়খন্ডের গ্রামে গঞ্জে। প্রথমটা লোকে বিশ্বাস করতে পারেনি কিন্তু যখন, রেডিও, টেলিভিশনে, খবরের কাগজে, রাঁচী, পাটনা, কোলকাতা, দিল্লী, বি.বি.সি লন্ডন, ভয়েস অফ্ আমেরিকা থেকে নির্মলের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হতে থাকল তখন আর অবিশ্বাসের কিছু রইল না।

উলিয়ানের জগবন্ধু মাহাত, প্রিয়া মাহাতর উলিয়ানে, সোনারী, কদমা, জামশেদপুর,সিংভূম,মানভূম, রাঁচী, হাজারীবাগ, পালামৌ, ধানবাদ, গিরিডি, সাঁওতাল পরগনা,ময়ুরভঞ্জ, কেঁওঝর, সুন্দরগড়, সম্বলপুর, রায়গড়, সরগুজা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় যেন বিনা মেঘে বাজ পড়ল। বুকফাটা কান্নায় উলিয়ানের সোনারীর আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

আততায়ীর গুলিতে সাংঘাতিক ভাবে জখম হয়ে নির্মল পড়ে গেল মাটিতে, আততায়ীরা পালিয়ে গেল। টাটা মেইন হসপিটালে পৌঁছানোর আগেই রাস্তায় মারা গেল নির্মল। নির্মলকে একপলক দেখার জন্য কাতারে কাতারে লোক ছুটল হাসপাতালের দিকে। ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার কর্মী, সমর্থক কর্তাব্যক্তিরা খবর পাওয়া মাত্র ছুটে এল কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। নির্মল যখন ছাত্র তখনও উত্তর বিহারীদের আক্রমণে গুরুতর আহত হয়ে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় টাটা মেইন হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছিল নির্মলকে। সেবারও সবাই ভেবে নিয়েছিল নির্মল বাঁচবেনা কিন্তু সে যাত্রা বেঁচে গিয়েছিল নির্মল। মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়ে পুনর্জীবন লাভ করলে নাকি তার পরমায়ু বেড়ে যায়। পুনর্জীবন প্রাপ্তরা সহজে মরে না। তাই অনেকেই বুকের মধ্যে আশার বীজ বুনছিল। নির্মল হয়ত এ যাত্রাও বেঁচে যাবে কিন্তু সবার আশায়

ছাই দিয়ে নির্মল এবার চলে গেল। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলীর পাতায় আর একটা ঘটনা যুক্ত হোল " আততায়ীর গুলিতে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার সভাপতি নির্মল মাহাতর মৃত্যু।"

গেষ্ট হাউস থেকে বেরোবার মুখে সঙ্গে ছিলেন বিহার বিধানসভার সদস্য, ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার উপনেতা সুরজ মন্ডল। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে তিনি বললেন, "সাত আগষ্ট রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ রাঁচী থেকে সুরজ মন্ডল, নির্মল মাহাত, বাবুলাল সোয়, শিবাজী রায় এবং কংগ্রেস (ই) নেতা জ্ঞানরঞ্জন একসঙ্গে ট্যাক্সিতে করে জামশেদপুর পৌছান, জামশেদপুরের কংগ্রেসী নেতা অবতার সিং তারীর মায়ের শ্রদ্ধানুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য। ওরা রাত সাড়ে দশটার সময় টিস্কো গেষ্ট হাউসে এসে ওঠেন। রাত একটা পর্যন্ত তারা বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। অতঃপর একটি কামরায় নির্মল মাহাত, শিবাজী রায়, বাবুলাল শোয় এবং অন্য একটি কামরায় জ্ঞানরঞ্জন ও সুরজ মন্ডল শুয়ে পড়ে।

৮ই আগষ্ট প্রায় পৌনে বারেটার সময় অবতার সিং তারীর বাড়ী যাওয়ার জন্য সুরজ মন্ডল, নির্মল মাহাতো, নির্মল ভট্টাচার্য এবং রাজেন্দ্রকুমার চৌধুরী বাইরে বেরিয়ে আসেন। টিস্কো গেষ্ট হাউস থেকে বেরিয়ে আসার সময় শংকর সিং এবং সুনীল সিং এর সঙ্গে দেখা হয় যারা অবতার সিং তারীর বাড়ী যাওয়ার জন্য ওদের অপেক্ষায় ছিল। ঐ সময়ই অমৃতবাজার পত্রিকার সাংবাদিক সুনীলবরন ব্যানার্জী এবং নরেন্দ্রকুমার সিং ওখানে পৌছান। সুরজ মন্ডল জ্ঞানরঞ্জনকে ডাকার জন্য লোক পাঠান। জ্ঞানরঞ্জনের অপেক্ষায় যখন ওরা গেষ্ট হাউসের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন ডি.ই.এ ২৫৪৪ নম্বর যুক্ত একটি ট্যাক্সি ওখানে এসে দাঁড়ায় এবং ঐ ট্যাক্সি থেকে ৫ জন লোক নামে। লোকগুলোকে দেখে সুরজ মন্ডলের সন্দেহ হলে নির্মলকে উনি জিজ্ঞেস করেন, এরা কারা? নির্মল ওদের দুজনের নাম বলে যারা বীরেন্দ্র সিং এর ভাই পন্ডিত এবং পাপ্পু। ওরা সোনারীতেই থাকে সেজন্য নির্মল ওদের চিনত। পন্ডিত গেষ্ট হাউসের দিকে চলে যায় এবং দাদা বীরেন্দ্র সিং এর সঙ্গে ফিরে আসে কিছুক্ষণ পরে। বীরেন্দ্র সিং কংগ্রেস সেবাদলের নেতা, যিনি কংগ্রেস নেতা, প্রাক্তন বিধায়ক জ্ঞানরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। পন্ডিত এবং বীরেন্দ্র সিং দুভাই ট্যাক্সির কাছে ফিরে এসে কানে কানে গল্প করতে থাকে। এরপরে একসময়ে বীরেন্দ্র সিং নির্মলকে লক্ষ করে গুলি চালায়, পন্ডিত নির্মলকে পিছন থেকে গুলি করে। নির্মল গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যায়। সুরজ মন্ডলের হাতেও গুলি লাগে এরপর সুনীল সিং তার পিস্তল থেকে শুন্যে গুলি চালালে আততায়ীরা ট্যক্সি ছেড়ে পালিয়ে যায়। ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার উপনেতা বিধায়ক সুরজ মন্ডল এই মর্মে এফ. আই. আর করেন থানায়।

অত লোকজনের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে নির্মলকে গুলি করে মেরে খুনীরা পালিয়ে গেল। ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার নেতা ও কর্মীরা আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় কিছুক্ষন

কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেন, নির্মল মাহাতোর খুনীরা ধরা না পড়া পর্যন্ত নির্মলের মৃতদেহ তাঁরা নেবেন না। মুক্তি মোর্চার কর্মীরা কেন, হতবাক হয়ে গেছল গোটা জামশেদপুর। অতঃপর এই বিহ্বল অবস্থাটা ক্রমশঃ কাটতে থাকে এবং জনসাধারণের মনে প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনা ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করে দেয় গোটা জামশেদপুরকে। গামারিয়ার কাছে একজন কংগ্রেসী নেতাকে উন্মত্ত জনতা হত্যা করে। এরকম আরও কিছু কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে গোটা সিংভূম এলাকা জুড়ে। জনরোষ যেন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়তে থাকে চারিদিকে। জামশেদপুর থেকে ঘরবাড়ী ফেলে পালাতে শুরু করে লোকজন। অন্যদিকে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, রাঁচী, হাজারীবাগ পালমৌ এক কথায় গোটা ঝাড়খন্ড এলাকা থেকে লোক আসতে থাকে, ট্রেনে এবং পায়ে হেঁটে। টাটানগর স্টেশনে এসে টাটানগরকে পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে থাকতে দেখে পায়ে হেঁটে রওনা দেন উলিয়ানের দিকে। প্রিয় নেতাকে শেষ দেখা দেখার জন্য হাজার হাজার লোক আসছে তো আসছেই। শেষ নেই, বিরামহীন।

জামশেদপুর থেকে প্রকাশিত ইংরাজি দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা মৃত নির্মলের ছবি দিয়ে প্রথম পাতায় খবর ছাপে, "Nirmal Mahata gunned down"। অমৃত বাজার পত্রিকা একটা পুরো পাতা জুড়ে "Messiah of the tribals" শিরোনামে নির্মলের বিভিন্ন সময়ের ছবি ছাপে, মত্যুর পরে বাবা, মা ও সহকর্মীদের ক্রন্দনরত ছবিগুলি অত্যন্ত মর্মপশী। ৯ আগস্ট অমৃতবাজার পত্রিকা লিখে 'মিঃ নির্মল মাহাত, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সভাপতি টিস্কো গেস্ট হাউসের সামনে, উত্তর জামশেদপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার বিহার বিধানসভার উপনেতা সুরজ মণ্ডলও আহত হন। তাকেও টাটা মেইন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নির্মল মাহাত হত্যায় জড়িত পরশুডিহির অখিলেশ সিং কে আজ সন্ধ্যায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, মুখ্য অভিযুক্ত বীরেন্দ্র সিং-এর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। সুরজ মণ্ডল বলেছেন, বীরেন্দ্র সিং এবং তার ভাই পণ্ডিত দুজনেই নির্মলের উপর গুলি চালায়। হত্যাকাণ্ডের সময় কং (ই) র-রাঁচীর প্রাক্তন বিধায়ক মিঃ জ্ঞানরঞ্জন, সিংভূমের প্রাক্তন এম. এল. সি এবং সিংভূম জেলা কংগ্রেসের সহ সভাপতি মিঃ ধনঞ্জয় মাহাত, পটমদার, প্রমুখ মিঃ সুরেশ খৈতান। সুনীল বরণ ব্যানার্জী ও নরেন্দ্র কুমার সিং এবং কংগ্রেস দলের বেশ কিছু কর্মী ও সমর্থক সেখানে উপস্থিত ছিল।"

জামশেদপুর থেকে প্রকাশিত, অমৃতবাজার, উদিতবাণী, নঈ রঙ্গ, রাঁচী থেকে প্রকাশিত, রাঁচি এক্সপ্রেস, আজ, ইত্যাদি ছোট বড় সমস্ত সংবাদ পত্র গুলি নির্মলের হত্যাকাণ্ডে মুখর হয়ে ওঠে। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত, আনন্দবাজার, যুগান্তর, আজকাল, বর্তমান, অমৃতবাজার, টেলিগ্রাফ, হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড। দিল্লী, এলাহাবাদ, পাটনা থেকে প্রকাশিত, মায়া, টুডে, ইত্যাদি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের পত্র

পত্রিকাগুলিও নির্মল মাহাত হত্যার ঘটনায় সরব হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। সিংভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির অধ্যক্ষ সনাতন মাঝি, সাধারণ সম্পাদক রামাশ্রয় প্রসাদ, উপাধ্যক্ষ কে. পি. সিংহ, বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, লেবার সচিব এম. এস. ছবন ইত্যাদিরা নির্মল মাহাত হত্যার নিন্দা করে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তারের দাবী করে। সি. পি. আই এর সিংভূম জেলা সচিব ডি. সি. সামন্ত জনসাধারণকে শান্তি বজায় রাখার জন্য এবং এই ঘৃণিত হত্যাকাণ্ডের গণতান্ত্রিকভাবে বিরোধ করার জন্য আহ্বান জানান। সিঁচাই কামগার ইউনিয়নের বিজয় চৌধুরী, ধলভূম কন্ট্রাক্টার ওয়ার্কাস ইউনিয়নের মাধব হেমব্রম, বিহার রাজ্য পত্থর তোড় মজদুর ইউনিয়নের এস. কে. ঘোষাল, ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কস ইউনিয়নের বি. এন. সিং ইত্যাদিরা বলেন, 'হত্যা দ্বারা জনতার আওয়াজকে দাবিয়ে রাখা যায় না। নির্মল মাহাতোর হত্যায় জনবাদী আন্দোলনের প্রভূত ক্ষতি হোল। অল ইণ্ডিয়া ইয়ুথ ফেডারেশনের ডি. সি. সামন্ত, অল ইণ্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশনের রাজেশ পাণ্ডে ইত্যাদিরা হত্যাকাণ্ডের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

'ইণ্ডিয়ান পিপলস ফ্রন্টের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, "নির্মল মাহাতোর হত্যা কংগ্রেস (আই) এর জনবিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী, সাম্প্রদায়িক এবং ভ্রষ্ট রাজনীতির মুখোশ খুলে দিয়েছে। জেলা যুব লোকদল রাজনৈতিক নেতাদের উপর লাগাতার হামলার নিন্দা করে নির্মল মাহাতর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে এক লাখ টাকা অনুদান দেওয়ার দাবী জানায়। জামশেদপুর নগর যুব কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপকুমার মিশ্র জামশেদপুরের লাগাতার রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ছাত্র সংঘর্ষ সমিতির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, "এই হত্যাকাণ্ড রাজনীতির মাফিয়াকরণের চিত্রটিকে উলঙ্গ করে দিয়েছে"। ভারতীয় জনতা পার্টি ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানায়। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ জামশেদপুরের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড গুলির জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

চক্রধরপুরে মনীবাবা ধর্মশালায় ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি সম্মিলিত ভাবে এক শোকসভার আয়োজন করেন। সভায় ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, রেলওয়ে ট্রেড ইউনিয়ন, নাগরিক সুরক্ষা সমিতি ইত্যাদি সংগঠনের নেতারা এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিরদ্ধে ভর্ৎসনা করেন। চন্দ্রমোহন সোয় সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় মঙ্গল প্রসাদ, বিজয় সিং সোয় (এম. এল. এ.) সুখদেব হেমব্রম, বাহাদুর ওরাও, অশোক সারগি, উমের মাহাত, আর. এন. শর্মা ইত্যাদি ব্যক্তিগণ হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেন, হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবী জানান এবং নির্মলের আশ্রিতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান। সভাশেষে নেতৃবর্গ নির্মল মাহাতর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

রাজরাপা থেকে জে. এম. এম. এর প্রাক্তন বিধায়ক অর্জুন রাম এবং নোচর

গোলা প্রখণ্ড সচিব কে. পি. চক্রবর্তী হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেন। তেনুঘাটের বেরমো অনুমণ্ডলের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ এবং ছাত্র সংগঠন নির্মল মাহাতর নির্মম হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেন। স্থানীয় সাড়ম বাজারে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার কার্যকর্তারা নির্মলের হত্যাকে এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেন এবং হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবী জানান। জরিডি প্রখণ্ডের লোকদল নেতারা পার্টি বৈঠকে নির্মল মাহাতর আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। জারিডি প্রখণ্ডের ভারতীয় জনতা পার্টির অধ্যক্ষ শ্রীরঞ্জিৎ সিংহ নির্মল মাহাতর হত্যাকাণ্ডকে অত্যন্ত দুঃখজনক বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিন্দেশ্বরী দুবের কার্যকালে কারও জীবনই সুরক্ষিত নয়।

৯-৮-৮৭ স্টেটসম্যান পত্রিকায় ছাপা হয় নির্মল মাহাতর মৃত্যুর সংবাদ, প্রতিবেদক বলেন "নির্মল মাহাত হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দোকানদাররা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিতে থাকেন, পাবলিক ট্রান্সপোর্টগুলিও রাস্তা থেকে উধাও হয়ে যায়। গোটা জামশেদপুরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে যেখানে আদিবাসীরা এক বিশাল সংখ্যায় বসবাস করেন। মিঃ নির্মল মাহাত আদিবাসীদের একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। জামশেদপুরের এটি দ্বিতীয় রাজনৈতিক হত্যা। গত জুন মাসে কংগ্রেস (ই)-র একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে হত্যা করা হয়। যিনি আদিবাসী ছিলেন।

ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা গত এক বছর থেকে পৃথক রাজ্য আদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছেন। ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে তারা কালো ব্যাজ ধারণ করে প্রতিবাদ জানায়। তারা ঝাড়খণ্ডী বাহিনী তৈরী করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন। সিংভূম, রাঁচী, গুমলা, লোহারডাগা, পালামৌ, সাহেবগঞ্জ, দুমকা, বিহারের এই সমস্ত জেলাগুলিতে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রচণ্ড জনসমর্থন আছে। এই জেলাগুলিতে আদিবাসীদের সংখ্যাও প্রচুর। নির্মল মাহাতোর হত্যাকাণ্ডে এই এলাকায় দারুণ প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রশাসনিক অফিসাররা বলেন, যদিও উত্তেজনা তুঙ্গে আছে তবু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায় নি।"

গোটা ঝাড়খণ্ড এলাকা থেকে হাজারে হাজারে লোক আসতে থাকে জামশেদপুরে। উত্তেজনা ছড়াতে, থাকে এলাকায়। ক্রুদ্ধ জনতা গামারিয়ার কাছে অমরেন্দ্র সিং নামের একজন কংগ্রেসী নেতাকে হত্যা করে। সুবর্ণরেখা প্রকল্পেও ক্রুদ্ধ জনতার হাতে একজন নিহত হয়। উত্তেজনা ঝাড়খণ্ড কংগ্রেসের দাঙ্গায় রূপ নিতে থাকে। সিংভূমের কংগ্রেস সেবাদলের প্রধান, হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত বীরেন্দ্র সিংকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়। হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতারা হাসপাতাল থেকে নির্মলের মৃতদেহ নিতে অস্বীকার করেন।

জামশেদপুর, সোনারী, কদমা, উলিয়ানের লোকেরা এতোদিন নির্মল সম্পর্কে ততটা উচ্চ ধারণা পোষণ করত না। কিন্তু নির্মলের মত্যুর খবর পেয়ে যখন বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজারে হাজারে নির্মলের গুণমুগ্ধরা জামশেদপুরে আসতে থাকে

তখন তাদের মন থেকে নির্মল সম্বন্ধীয় ধারণাটা একেবারে পাল্টে যায়। পরদিনই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোর্চার নেতারা জামশেদপুরে চলে আসেন। মোর্চার সম্পাদক শিবু সোরেন জনসাধারণের উত্তেজনা প্রশমনের জন্য প্রাণপন চেষ্টা করতে থাকেন।

'আজকাল' পত্রিকার সাংবাদিক দেবী দাশগুপ্ত, "খুনীর বুলেটে প্রাণ হারালেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সভাপতি" শীর্ষক প্রতিবেদনে বলেন, "ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সভাপতি নির্মল মাহাতো খুনীর বুলেটে প্রাণ হারালেন জামশেদপুরে। আবার প্রমাণিত হল বিহারের প্রশাসন ও পুলিশ কতখানি অপদার্থ। এই হত্যাকাণ্ড বেলা ১২টার সময় টাটা কোম্পানীর গেস্ট হাউসের সিড়ির উপরে ঘটে। পুলিশ প্রথমেই এই ঘটনাকে নিজেদের বিবাদ বলে চালাবার চেষ্টা করে। বেলা ১২টা নাগাদ একটি কালো এ্যাম্বাসাডার গাড়ী (নং-ডি. ই. এ. ২৫৪৪) করে আততায়ী দল গেস্ট হাউসে আসে। এই দলে ৩/৪ জন লোক ছিল বলে জানা যায়। গোটা পরিকল্পনাটাই কুখ্যাত সমাজ বিরোধী এবং কংগ্রেস সেবাদলের নব নির্বাচিত সদস্য বীরেন্দ্রকুমার সিংহের মস্তিষ্ক প্রসূত বলে জানা গেছে। বীরেন্দ্র সিং, জামসেদপুরের সোনারী অঞ্চলে থাকে এবং কিছুদিন আগে ঐ অঞ্চলে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সদস্যদের সঙ্গে এই সিং এর অনুগামীদের এক সংঘর্ষও হয়ে গেছে বলে জানা গেল। কিন্তু নিছক দলাদলিতেই নির্মল মাহাতোকে হত্যা করা হয়েছে, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। কংগ্রেস সেবাদল থেকে বীরেন্দ্র সিংয়ের সদস্যপদ অস্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু বিহার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জানিয়েছেন শ্রী সিং কংগ্রেস দলের সদস্য। তবে এই হত্যাকাণ্ডের পরে তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। একথাও আজ কারও অজানা নেই যে বীরেন্দ্র সিং-এর সঙ্গে বিহারের জনৈক প্রভাবশালী মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। প্রভাত মাহাতোর সঙ্গে মোর্চা দলের উপনেতা সুরজ মণ্ডলের হাতেও গুলি লাগে এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ আততায়ীদের গাড়িটি গামারিরায় পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। কিন্তু বীরেন্দ্র সিং এবং তার দুই অনুচরদের পাত্তা এখনও মেলেনি। তবে আক্রমণকারীদের মধ্যে একজন অখিলেশ সিংকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। একটা কথা খুব পরিকার, নির্মল মাহাতো যে ঐদিন জামশেদপুরে টিস্কো গেস্ট হাউসে থাকবেন একথা আততায়ীদের আগেই জানা ছিল। শ্রীমাহাতো যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন তখনই শোনা যায়, "মার দো শালো কো, ছোড়না মত।" আর অবস্থা বেগতিক বুঝে মাহাতোর সঙ্গী সুরজ মণ্ডল তাকে নিজের কামরায় ফিরে যেতে বলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বীরেন্দ্র সিং-এর গুলিতে ধরাশায়ী হন নির্মল মাহাতো। বীরেন্দ্র সিং ও তার অনুচরেরা গাড়ীতে উঠে পালায়। নির্মল মাহাতোর হত্যাকে কেন্দ্র করে ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে উত্তেজনা দেখা দেয়। মর্গ ঘেরাও করে আটকে রাখা হয় শবদেহ। হত্যার প্রতিবাদে জামশেদপুর, রাঁচী শহর ও অন্যান্য স্থানেও বনধ পালন করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে কি উদ্দেশ্য ছিল একথা হয়ত পুলিশী তদন্তে কোনও দিন প্রকাশ পাবে না। তবে সোনারী অঞ্চলে

ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সাম্প্রতিক প্রভাব প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই অনেক রাজনৈতিক দল ও কর্মীর পক্ষে মনঃপুত হয়নি, একথা বোঝা যায়। বীরেন্দ্র সিংএর দলীয় রাজনীতি কতখানি এই হত্যার জন্য দায়ী একথা বলা সহজ নয়। তবে এখন হয়ত শাসকদলের নাম করে মামলাটি আপস রফা করার প্রয়াস চালানো হতে পারে। ঘটনাটি যেমন একেবারেই রাজনীতি বলা যায় না, তেমন একে শুধু ঘরোয়া বিবাদ বলেও গণ্য করা ঠিক হবে না। নির্মল মাহাতোর মৃত্যুতে নিশ্চয়ই সিংভূম জেলায় মোর্চার উপরে বিশেষ আঘাত লেগেছে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে যারা উৎপীড়ন, অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুমের বিভীষিকা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করায় বদ্ধ পরিকর তাদের অনুকুলে নির্মল মহাতোর হত্যা খানিকটা সুযোগ এনে দিতে পারে। বলা বাহুল্য একজন নির্মল মাহাতোকে হত্যা করে যেমন ঝাড়খণ্ডের দাবীকে রোখা যায় না, তেমন তাঁকে হত্যা করেই অপরাধের সন্ত্রাস সৃষ্টি করা যাবে একথাও বিশ্বাস করা কঠিন। নির্মল মাহাতোর হত্যার অব্যবহিত বাদেই মোটর সাইকেল আরোহী এক কংগ্রেস কর্মীকে পথে গুলি করা হয় এবং হাসপাতালে সে মারা যায়। মাহাতো হত্যা নিয়ে যে তীব্র উত্তেজনা ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল মোর্চার সাধারণ সম্পাদক ও সংস্থাপক নেতা শিবু সোরেন ও অন্যান্য আদিবাসী নেতাদের প্রচেষ্টায় তা অনেকখানি প্রশমিত হয়েছে। তবে এখনও সতর্কতা ও সমঝোতার বিশেষ প্রয়োজন আছে।”

ঝাড়খণ্ড এলাকাজুড়ে বনধ

নির্মলের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ঝাড়খণ্ড ক্লান্তি দল ইত্যাদি ঝাড়খণ্ড সমর্থক দলগুলির কর্মী ও সমর্থকদের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। লোকদল, জনতা, বি.জে.পি, সি. পি. আই ইত্যাদি বিরোধী দলের প্রতিনিধিদের মনেও তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। কারণ নির্মল শুধু মুক্তি মোর্চার নেতা হিসেবেই জনপ্রিয় ছিল না নির্মলের জনপ্রিয়তা ছিল দলমতের উর্ধে।

রাঁচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রামদয়াল মুণ্ডা, ডঃ বি. পি. কেশরী, ডঃ নির্মল মিত্র, ডঃ শশীভুষণ মাহাত, সঞ্জয় বসুমল্লিক, ডঃ প্রভাত কুমার সিং পুরুলিয়াতে সূর্যনারায়ণ মাহাত, সুনীল মাহাত, পশুপতি মাহাত, সৃষ্টিধর মাহাত, অজিত মাহাত, নন্দলাল মাহাত, ধানবাদে বিনোদ বিহারী মাহাত, জামশেদপুরে ডাঃ বিদ্যাভূষণ মাহাত এ্যাডভোকেট প্রফুল্ল মাহাত, রাধাগোবিন্দ মাহাত, ডঃ বঙ্কিম মাহাত, ঝাড়গ্রামে ডাঃ মনোরঞ্জন মাহাত, বিভূতি মাহাত, জয়রাম মাণ্ডি, বিষ্ণু সোরেন, ডঃ বিনয় মাহাত, উড়িষ্যার পদ্মলোচন মাহাত, এ্যাডভোকেট গিরিশ মোহান্ত ইত্যাদি বুদ্ধিজীবিদের মধ্যেও নিমল হত্যাকাণ্ডে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

একদিকে যেমন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার শিবু সোরেন, ছত্রপতি শাহি মুণ্ডা, সাইমন মারাণ্ডী, স্টীফেন মারাণ্ডী, কৃষ্ণা মাণ্ডী, মাছুয়া গাগরাই, শৈলেন্দ্র মাহাত, চম্পাই

সোরেন, বিদ্যুৎ মাহাতরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তেমনই অন্যদিকে ঝাড়খণ্ড পার্টির এন. ই. হোরো, মনোরঞ্জন মাহাত, নরেন হাঁসদা, বিজয় মাহাত, বিক্ষুব্ধ ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার বিনোদ বিহারী মাহাত, আনন্দ মাহাত, টেকলাল মাহাত, দেবেন মাঝি, হেলেন কুজুর, অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্টস ফেডারেশনের প্রভাকর টিরকি, সূর্য সিং বেসরাও প্রতিবাদ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নির্মলের মত্যু বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদের ক্রমবর্ধমান বিরোধ ভুলে এক জায়গায় সকলকে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়।

শুধু, জামশেদপুর নয়, রাঁচী, ধানবাদ, ঝাড়গ্রাম, বারিপদা, ময়ূরভঞ্জ, কেঁওঝর, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা ইত্যাদি এলাকায় বন্ধ পালিত হয়। অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ঝাড়খণ্ড বন্ধের ডাক দেয় কিন্তু একই দিনে গোটা এলাকায় বন্ধে সাড়া না পাওয়া গেলেও, রাঁচী, ধানবাদ, সিংভূম ঝাড়গ্রাম ইত্যাদি এলাকায় বন্ধ পালিত হয়। ঝাড়খণ্ড এলাকায় প্রতিটি জেলা শহরে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

১০ই আগস্ট ১৯৮৭ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং ছাত্র সংগঠন নির্মলের জঘন্য হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ১২ আগস্ট রাঁচী বন্ধের ডাক দেয়। বিহার বিধান পরিষদের সদস্য ভাই হেলেন কুজুর, জে. এম. এম., রাঁচীর সংযোজক মহেন্দ্র কচ্ছপ ও আজসু অধ্যক্ষ প্রভাকর টির্কি এক সংযুক্ত বক্তব্যে হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে। আজসুর রাঁচী জেলা কমিটির অধ্যক্ষ শ্রীদেবশরণ ভগত নিমলের হত্যাকাণ্ডকে গণতন্ত্র হত্যার সংজ্ঞা দেয়। আজসুর রাঁচী শাখা আদিবাসী ছাত্রাবাসের এক বৈঠকে এই হত্যার নিন্দা করে এবং হত্যাকারীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবী জানায়। এই সভায় প্রভাকর টির্কি, রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামন্ত্রী প্রদীপ ওঁরাও, কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য বিনোদ ভগতও উপস্থিত ছিলেন। রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনগ্রসর ছাত্র সংঘের এক বৈঠকে হত্যাকাণ্ডের জন্য গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবী জানানো হয়।

বিহার প্রদেশ ছাত্র জনতার মহামন্ত্রী রাজীব রঞ্জন মিশ্র, রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জনতার সচিব বিশু প্রসাদ, রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় শৈক্ষনিক দপ্তরের মহাসচিব সুতি ভট্টাচার্য এবং সচিব বিজয় সিংহ আলাদা আলাদা বক্তব্যে হত্যাকাণ্ডকে ঘৃণিত আখ্যা দিয়ে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির লেবার সেলের অধ্যক্ষ রানা সংগ্রাম সিংহ নির্মলের হত্যায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেন গণতান্ত্রিক দেশে এরকম হত্যাকাণ্ড দুঃখজনক। রাঁচী জেলার কর্মচারী এবং মজদুর সমন্বয় সমিতির সচিব উমেশ চৌধুরী, বিহার প্রদেশ গ্রামীণ মজদুর কংগ্রেসের মহামন্ত্রী উনেশ্বর মণ্ডল, রাঁচী জেলা কংগ্রেস কমিটির বিধি সেলের সংযোজক শ্রীমনোহর সিং ইত্যাদি হত্যাকাণ্ডের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বোকারোতে ঝাড়খণ্ড ক্রান্তিদলের অধিবেশনে নির্মল মাহাতর হত্যাকাণ্ড কংগ্রেস সরকারের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল বলে মন্তব্য করা হয় এবং আরও বলা হয় যে এরকম সন্ত্রাসের রাজনীতিতে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকে দমন করা যাবে না। ভারতীয়

জনতা পার্টির বিধায়ক সমরেশ সিং, হত্যাকাণ্ডে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকে দোষী করেন। বোকারো হরিজন কল্যাণ পরিষদ এর রাষ্ট্রীয় মহাসচিব গয়া সিং, লোকদল নেতা অকলুরাম মাহাত, ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক রাধে মুণ্ডা, নগর অধ্যক্ষ রাম চন্দ আদি সকলেই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেন।

চাইবাসায় জে. এম. এম. বিধায়ক শ্রীবিজয় কুমার সোয়-এর নেতৃত্বে এক মৌন মিছিল শহরের বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে এবং শেষে হাট ময়দানে এক বিশাল জনসভায় পরিণত হয়। উক্ত সভায় ভারতীয় জনতা পার্টির স্থানীয় নগরপালিকা উপস্থিত জনসভাকে সম্বোধন করে বলেন, উত্তর বিহারের মত দক্ষিণ বিহারেও রাজনৈতিক হত্যা সংগঠিত হোল। তিনি নির্মলের হত্যাকাণ্ডে উচ্চমহলের রাজনৈতিক নেতাদের হাত আছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বিধায়ক বিজয় কুমার শোয় হত্যাকাণ্ডে মন্ত্রী রামাশ্রয় প্রসাদ সিংহের হাত আছে বলে দোষারোপ করেন।

১৩ই আগষ্টের রাঁচী এক্সপ্রেস রাঁচী বন্ধ (১২ আগষ্ট) সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে লিখেছে "ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্মল মাহাত হত্যার প্রতিবাদে জে. এম. এম. আজ এবং অন্যান্য সংগঠন দ্বারা আয়োজিত রাঁচী বন্ধ সম্পূর্ণ সফল হয়েছে।

দুপুরের পরে জে. এম. এম এবং আজসু বন্ধের সমর্থনে একটি মিছিল বার করে। ট্রাকের উপর থেকে সমর্থকেরা "জয় ঝাড়খণ্ড, নির্মল মাহত অমর রহে, কংগ্রেসের গুন্ডামী বন্ধ কর" ধ্বনি দিতে দিতে মেন রোড দিয়ে সুজাতা সিনেমা হলের পাশ দিয়ে বারিপার্ক ময়দানে পৌঁছে একটি শোকসভা করেন। শোকসভায় নির্মলের আত্মার শান্তি কামনায় দু মিনিট নীরবতা পালন করে এবং শহীদ নির্মলের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন করে। বিহার বিধান পরিষদের সদস্য ভাই হেলেন কুজুর এবং সভাপতি প্রভাকর টির্কি মিছিল পরিচালনা করেন।

ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার পরবর্তী সভাপতি মনোনীত হন শিবু সোরেন এবং সম্পাদক হন শৈলেন্দ্র মাহাত। শিবু সোরেন ও শৈলেন্দ্র মাহাত নির্মলের হত্যকাণ্ডের নিষ্পত্তির জন্য সি. বি. আই তদন্ত দাবী করেন। ছোটনাগপুর ছাত্রসংঘের মহাসচিব সুভাষ ভগত, মুখ্য সংরক্ষক করমা ওরাঁও, নাগরিক কল্যাণ পরিষদের (রাঁচি) সংযোজক বিনোদ কুমার জয়সওয়াল, ঝাড়খণ্ড ক্রান্তি দলের মহাসচিব উইলিয়াম লুমুন, সি. পি. আই (এম. এল) এর বিহার প্রান্তীয় কমিটির সদস্য নন্দকিশোর সিংহ ছোটনাগপুর যুব জনতার অধ্যক্ষ শ্যামনাথ পাণ্ডে, মহামন্ত্রী তারাচাঁদ গোস্বামী, মুসলিম লীগের ছোটনাগপুর শাখা, রাঁচী যুব জনতার মহামন্ত্রী বিজয় শংকর, ছাত্র জনতার অধ্যক্ষ সঞ্জয় পাণ্ডে ইত্যাদি বিভিন্ন সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীরা নির্মল মাহাত হত্যাকাণ্ডের উচ্চস্তরীয় তদন্তের দাবী জানান। ২১ সেপ্টেম্বর বিহার সরকার নির্মল মাহাত হত্যাকাণ্ড সি. বি. আই. দ্বারা তদন্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেন।

নির্মলের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া

১০ আগষ্ট ১৯৮৭ জামশেদপুরের বুকে এক ঐতিহাসিক দৃশ্যের অবতারণা হয়। নির্মলের মৃত্যু সংবাদ শোনার পর থেকে ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগণা তথা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশের প্রস্তাবিত ঝাড়খণ্ড এলাকার গ্রাম গ্রামান্তর থেকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ ছুটে আসতে থাকে। ৮ আগষ্ট থেকেই তাদের প্রিয় নেতাকে শেষবার দেখার জন্য। জামশেদপুর তখনও পুরোপুরি বন্ধ, যানবাহন চলাচল একেবারে বন্ধ, বন্ধ দোকান পাট। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মেয়ে পুরুষের ভীড় জামশেদপুর ষ্টেশন থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে উলিয়ানের দিকে। জে. এম. এম. হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত মৃতদেহ নিতে অস্বীকার করেছিল। মোর্চার সম্পাদক শিবু সোরেন আসার পর তিনি মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ১০ আগষ্ট। আট তারিখ থেকে আসা লোকজন সব ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে থেকে যায় দশ আগস্ট পর্যন্ত।

১১ই আগষ্টের অমৃতবাজার পত্রিকা নিমলের এই শেষ যাত্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখে "হাজার হাজার আবেগ আপ্লুত নরনারী নির্মলের শেষ যাত্রায় সঙ্গী হয়। হাজার হাজার নরনারীর বিশাল এই মৌনমিছিল সিংভূমের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা।" লক্ষাধিক জনতার এই মৌন মিছিল গোটা রাস্তা জুড়ে নিংশব্দে হাঁটতে হাঁটতে সোনারী জুবলি পার্ক, সাঁকচি, বিষ্টুপুর, ধাধকি হয়ে কদমা, উলিয়ানের গাইড ক্লাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। আবেগে আপ্লুত এই মিছিল যে কোনো মুহূর্তে হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠতে পারত এবং সেই সম্ভাবনা ছিল শতকরা নিরানব্বই ভাগ। কিন্তু ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার অবিসংবাদি নেতা শিবু সোরেন, সম্পাদক শৈলেন্দ্র মাহাত, কৃষ্ণ মাণ্ডি, চপাই সোরেন, বিদ্যুৎ মাহাত, মাছুয়া গাগরাই, সুধীর মাহাত ও হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবীর অক্লান্ত পরিশ্রমে তেমন কিছু অঘটন সেদিন ঘটেনি।

নির্মলের বাড়ীর কাছে উলিয়ানের ময়দানে নির্মলকে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপনের জন্য ঘন্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন হাজার হাজার নরনারী শান্ত সুশৃঙ্খল, মরদেহধারী দেবতার পায়ে একমুঠো ফুল ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। লক্ষাধিক নরনারীর বাঁধভাঙ্গা চোখের জলের বিদায় সম্ভাষণে, হাজার হাজার নরনারীর নাম কান্নার মহামন্ত্রের ধ্বনির মধ্য দিয়ে নির্মলকে শায়িত করা হয় অন্তিম শয়ানে। নির্মলের সমাধির উপরে চোখের জলের ফুল ছড়িয়ে দিয়ে যে যার বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়।

ঐ দিনই ছ'দফা দাবিপত্র সম্বলিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সম্পাদক সদস্য নন্দকিশোর সিংহ ছোটনাগপুর যুব জনতার অধ্যক্ষ শ্যামনাথ পান্ডে, মহামন্ত্রী তারাচাঁদ, শৈলেন্দ্র মাহাতর প্রস্তাব থেকে। এই দাবীপত্রের প্রথম দাবী বিহারের সেচমন্ত্রী রামাশ্রয় প্রসাদ সিংকে সিংভূম জেলার মিনিষ্টার ইনর্চাজ পদ থেকে তাড়াতে হবে এবং সিংভূমে প্রবেশ নিষেধ ঘোষণা করতে হবে কারণ নির্মল মাহাত হত্যাকাণ্ডে মুখ্য অভিযুক্ত বীরেন্দ্র সিং এর সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। দ্বিতীয় দাবী

বাধেন সিং এর পরিবার এবং কংগ্রেস নেতা মগন বাহাদুর সিংকে সিংভূম থেকে বহিষ্কার করতে হবে। তৃতীয় দাবী টিস্কোর ভাইস প্রেসিডেন্ট এস. এন. পাণ্ডেকে তার পদ থেকে হটাতে হবে। চতুর্থ দাবী সিংভূমের নতুন ডেপুটি কমিশনার এ. কে সিনহা রামাশ্রয় প্রসাদ সিংহের লোক তাকে ডি. সি. হিসেবে জয়েন করতে দেওয়া চলবে না। পঞ্চম দাবী ৮ই আগষ্ট থেকে প্রতি বছরই নির্মল মাহাত শহীদ ময়দানে তিনদিন ব্যাপী শহীদ মেলা অনুষ্ঠিত হবে এবং ষষ্ঠ দাবী জামশেদপুর থেকে গুণ্ডারাজ খতম করতে হবে।

বীরেন্দ্র সিং গ্রেপ্তার

নির্মলের হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিহার বিধানসভা তোলপাড় হয়ে যায়। জামশেদপুর পুলিশকর্তা অরুণ চন্দ্র বর্মা ঘোষণা করেন, "নিমল মাহাতর হত্যাকাণ্ডে প্রধান অভিযুক্ত বীরেন্দ্র সিং কে যে ধরিয়ে দিতে পারবে বা তার সংবাদ দিতে পারবে তাকে তাৎক্ষণিক পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।" ১লা সেপ্টেম্বর'৮৭ সকাল সোয়া পাঁচটার সময় পাটনার দীঘা গ্রামের এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে পুলিশ বীরেন্দ্র সিংকে গ্রেপ্তার করে। ৩রা সেপ্টেম্বর জামশেদপুর এ্যাসিস্ট্যান্ট চিপ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। জামশেদপুর জেলের স্পেশাল সেলে তাকে রাখা হয়।

গ্রেপ্তার হওয়ার আগে এক গোপন সাক্ষাৎকারে এবং গ্রেপ্তার হওয়ার পরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বীরেন্দ্র সিং নিজেকে নির্দোষ বলে অভিহিত করে। ও বলে নির্মল মাহাতর সঙ্গে বর্তমানে তার কোন শত্রতা ছিল না সুতরাং তাকে হত্যা করার তার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল। নির্মলের ভাই সুশীলের বিয়ের সময় নির্মল ওকে নেমন্তন্ন করেছিল। বীরেন্দ্র নিজে না গেলে ও ভাইকে পাঠিয়েছিল বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য। নির্মল মাহাতর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে ওর মন্তব্য, রাঁচীর কংগ্রেস নেতা জ্ঞানরঞ্জনের সঙ্গে শিবু সোরেন তথা সুরজ মণ্ডলের যোগাযোগ আছে। এ প্রসঙ্গে ও নির্বাচনে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ও কংগ্রেসের নির্বাচনী আঁতাতের উল্লেখ করে। বীরেন্দ্রর বক্তব্য অনুযায়ী নির্মল তার রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা সুরজ মণ্ডল বা শিবু সোরেন অপেক্ষা বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং কংগ্রেসের সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ স্থাপনের বিরোধী মনোভাব পোষণ করত। যার ফলস্বরূপ জে. এম. এম. ও কংগ্রেস নেতৃত্বের চক্রান্তে নির্মলকে প্রাণ দিতে হয়।

বীরেন্দ্র বলেছিল গেষ্ট হাউসে জ্ঞানরঞ্জন ওকে ডেকে পাঠিয়েছিল। জ্ঞানরঞ্জনের কামরাতেই ও ছিল হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে বেরিয়ে এসে দেখে নির্মল পড়ে আছে। ও ওখানে হতভম্ব হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল কিন্তু জ্ঞানরঞ্জন তাকে পালিয়ে যেতে বলে। কিছু চিন্তা না করেই ও পালায়। পরে প্রাণের ভয়ে পুলিশের হাতে ধরা দেয়নি। পালিয়ে বেড়িয়েছে। ওর বক্তব্য একটা বিরাট চক্রান্তকে চাপা দিতে তাকে বলির পাঁঠা করা হয়েছে।

বীরেন্দ্র নিজের দোষ স্খালণের জন্য বলেছিল, নির্মল আততায়ীর গুলিতে নিহত হওয়ার পরও ওখানে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়েছিল কিন্তু নেতা জ্ঞানরঞ্জনের কথায় পালাতে বাধ্য হয়। যদি সে নিজে হত্যাকারী হত তাহলে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকত না। এই কথার যথার্থতা উপলব্ধী করার জন্য এস. পি. অরুণ চন্দ্র বর্মা বীরেন্দ্রকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যান এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে নির্মল যেখানে পড়েছিল সেই জায়গাটা দেখাতে বলেন। কিন্তু বীরেন্দ্র সিং সঠিক জায়গা দেখাতে পারেনি। সুতরাং ও যে বলেছিল নির্মলের মত্যুর পরেও ও ওখানে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়েছিল তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সুরজ মণ্ডল বীরেন্দ্র সিং এর কথাকে বানানো গল্প বলে অভিহিত করেন। মুক্তি মোর্চার নেতারা এটাকে মুক্তি মোর্চার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চক্রান্ত বলে অভিহিত করেন। তাছাড়া ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার বর্তমান সম্পাদক শৈলেন্দ্র মাহাত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এর তীব্র বিরোধীতা করেন। বীরেন্দ্র সিংকে গ্রেপ্তার করে জামশেদপুরে নিয়ে আসার পর তার প্রেস কনফারেন্স করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানান। শৈলেন্দ্র মাহাত জানান, "বীরেন্দ্র সিং এর, গ্রেপ্তারের পর তাদের আশা ছিল অন্য অপরাধীরাও গ্রেপ্তার হবে এবং হত্যাকারীর অস্ত্রশস্ত্রও উদ্ধার হবে কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন উল্টে বীরেন্দ্র সিং কে তার মিথ্যা বক্তব্য প্রচারের সুযোগ করে দিচ্ছে।"

পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আগেই অপরাধীর মিথ্যা বক্তব্য বিশালভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে জনসাধারণকেই শুধু বিভ্রান্ত করবে না তদন্ত পরিকল্পনাকেও প্রভাবিত করবে। তিনি আরও বলেন গ্রেপ্তারের ৯০ দিনের মধ্যে তদন্ত হওয়ার আগেই অপরাধীকে বিবৃতি প্রচারের সুযোগ করে দেওয়ার ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। পুলিশ প্রশাসন তাঁদের নিজেদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। তিনি আরও মন্তব্য করেন বীরেন্দ্রকে নিয়ে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলেছে বলে আমাদের অনুমান। শৈলেন্দ্র বলেন প্রায় ডজনখানেক গুরত্বপূর্ণ ব্যক্তির সম্মুখে ঘটনাটা ঘটে, একজন এম. এল. এ., একজন প্রাক্তন এম. এল. এ., দুজন সাংবাদিক ছিলেন তাদের মধ্যে। তারা সকলেই বীরেন্দ্রর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন এতৎসত্ত্বেও জনসাধারণের মধ্যে তাঁর বক্তব্য প্রচারের সুযোগ দানের পিছনে কোন যুক্তি নেই। শৈলেন্দ্র মাহাত স্থানীয় প্রশাসনকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেন, জনগণকে এভাবে বিভ্রান্ত করা থেকে তাঁরা যেন বিরত থাকেন এবং এও মন্তব্য করেন যে পুলিশের এ রকম ব্যবহার তাঁদের দাবী নির্মল মাহাত হত্যাকাণ্ডের সি. বি. আই দ্বারা তদন্ত হওয়া উচিত এ কথাকে মজবুত করছে।

নির্মল মাহাতর হত্যাকাণ্ডের মামলার কিভাবে নিষ্পত্তি ঘটে, ভবিষ্যৎ তার উত্তর দেবে। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আজন্ম যোদ্ধা নির্মল কি সুবিচার পাবে?

নির্মল মাহাতর হত্যাকাণ্ড এবং ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশের যে সমস্ত অঞ্চল নিয়ে ঝাড়খণ্ড আলাদা রাজ্যগঠনের মানচিত্র অঙ্কনের পরিকল্পনা, সেই এলাকা বহু প্রাচীনকাল থেকেই আদিবাসী তথা অনার্য ভারতের বংশধরদের লীলাক্ষেত্র। অনেকেই মনে করেন আর্য

সভ্যতার চাপে বেশ কিছু আদিবাসী গোষ্ঠী পিছু হটতে হটতে পাহাড় ও জঙ্গলাকীর্ণ ঝাড়খণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিল। এদের মধ্যে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাও, হো, কোল, কুড়মি, বীরহোড় ইত্যাদি প্রধান। যাদের নিজস্ব গোষ্ঠীভাষাগুলি তারা এখনও বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু জীবনচর্চা, ধ্যানধারণা, পালাপার্বণ, ধর্ম বিশ্বাস, নাচ গান ইত্যাদি মিলেমিশে একাকার হয়ে জন্ম নিয়েছে ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতি।

ঝাড়খণ্ডের পাহাড় জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েই যে এরা আর্য ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল একথা অবশ্যই বলা যাবে না। বরং বিভিন্ন সময়ে এদের উপর বিভিন্ন ধর্ম, জাতি, ভাষা, শাসন, শোষণ এবং সাংস্কৃতিক ঢেউ অপরিহার্যভাবে আছড়ে পড়েছিল। এর থেকে রেহাই পেতে এরা কখনও বিদ্রোহ করেছে কখনও বা প্রভাবিত হয়েছে কিয়দংশে কিন্তু এখনও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছে। আজও সেই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম অব্যাহত আছে এবং ঝাড়খণ্ড আন্দোলন যে সেই সংগ্রামের সর্বশেষ অধ্যায় এ মন্তব্যও অনেকের কাছ থেকে শোনা যায়।

পরেশনাথের পাহাড় ছিল জৈন ধর্মপ্রচারকদের মূল কেন্দ্র। যদিও জৈনধর্মাবলম্বী - গোষ্ঠী হিসেবে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সরাক'দের সন্ধান এতদঞ্চলে পাওয়া যায়, মূলতঃ জৈন ধর্মকে এই এলাকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীগুলি অস্বীকার করেছিল। কথিত আছে জৈনধর্মগুরু মহাবীরের পিছনে এখানকার লোক কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে এই এলাকায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা এখানে বিরল। গৌতম বুদ্ধের জন্মতিথি বুদ্ধপূর্ণিমা সারা ভারতবর্ষে পূণ্যতিথি হিসেবে অহিংসভাবে পালিত হয়। কিন্তু অযোধ্যা পাহাড়ে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি এদিন মহাধুমধামে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করে শিকার উৎসব।

যোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যখন প্রথম ঝাড়খণ্ড এলাকায় আসেন তখন এখানকার মানুষ তাঁকে গ্রহণ করেনি। তাই চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে, "মথুরা যাবার কালে আসি ঝাড়িখণ্ড, ভীল্ল প্রায় লোক তাহে পরম পাষণ্ড।" কারও কারও মতে হিন্দুধর্ম থেকে আত্মরক্ষার্থে এখানকার আদিবাসীরা গোমাংস ভক্ষণ করে, অবশ্য কুড়মি, রাজোয়াড়, কামার, কুমোর ইত্যাদি কৃষিজীবি বা বৃত্তিজীবি গোষ্ঠীগুলি এখনও গরুকে কৃষিকর্মের সহায়ক হিসেবে দেবতাজ্ঞানে পুজো করে।

ইসলাম ধর্ম থেকে আত্মরক্ষার্থে এরা নাকি শূকর ভক্ষণ করে। কিন্তু খ্রীষ্টান থেকে আত্মরক্ষার তেমন কোন উপায় উদ্ভাবন করতে না পেরে এরা অনেকেই খ্রীষ্টান হয়ে যান। অবশ্য হিন্দু, মুসলমান, বৈষ্ণব ইত্যাদি ধর্মীয় অভিযান যে একেবারে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল তা নয় বরং উক্ত ধর্মমতগুলি আদিবাসীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই এখানকার আদিবাসীদের একটা বিরাট অংশের মানুষের ধর্মান্তরিত অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে পাশাপাশি যেন তাদের আদিবাসীত্বের লক্ষণগুলি আজও অবলুপ্ত হয়ে যায়নি।

এই বিভিন্ন ধর্মীয় ভাষা এবং সাংস্কৃতিক তথা জীবনচর্চার ঢেউ বিভিন্ন সময়ে এখানে আছড়ে পড়ার ফলে, সবদিক থেকেই বৃহত্তর ভারতীয় জনস্রোতের সঙ্গে লেনদেন হয়েছে এবং ভাষা, সাংস্কৃতিক ও ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে সমৃদ্ধই হয়েছে এই এলাকা। তবু এই এলাকার মানুষের ধারাবাহিক সংগ্রামের ইতিহাসকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

১৭৬৭—১৮৫৫ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ সাঁওতাল বিদ্রোহ পর্যন্ত প্রায় একশ বছর এই অঞ্চলে দৃঢ়ভাবে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা কায়েম করা যায়নি। ১৭৬৮-১৭৭৪ সাল পর্যন্ত কোম্পানী ধলভূমগড়ের রাজা জগন্নাথ ধলকে পর্যুদস্ত করতে পারেননি। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের নিকটবর্তী কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণির বিদ্রোহ, ১৮০৬-১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বগড়ি রাজসরকারের (গড়বেতা অঞ্চলে) প্রাক্তন সৈনিক অচল সিং এর বিদ্রোহ, ১৮৩১-৩২ সালে সিংভূমের কোলবিদ্রোহ, ১৮৩২-৩৩ সালে মানভূমের ভুমিজ বিদ্রোহ, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতালবিদ্রোহ (সাঁওতাল পরগণায়), ১৯২২ সালে রাঁচীর মুণ্ডা বিদ্রোহ, ওঁরাওদের টানা ভগত আন্দোলন ইত্যাদি এই এলাকার মানুষের স্বাধীন চেতনার সাক্ষ্য বহন করে।

শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসনকালের উক্ত বিদ্রোহগুলি বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে, ঝাড়খণ্ড এলাকার সামগ্রিক জনসমুদায় কখনই একযোগে বিদ্রোহে অংশ নেয়নি। সেজন্যই প্রচুর রক্তক্ষয় হওয়া সত্ত্বেও-সবগুলি বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

ভূমিজ বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, বা চুয়াড় বিদ্রোহ এই এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে প্রায় কুড়ি বছর স্থায়ী হয়েছিল। কোল বিদ্রোহ কেবলমাত্র কোল জাতিগোষ্ঠীই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের মূলে ছিল স্বাধীন সাঁওতাল রাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, মুণ্ডা বিদ্রোহে মুণ্ডারাজের, টানাভগত আন্দোলনও ওঁরাওদেরই গোষ্ঠীগত আন্দোলন। ভূমিজ, কোল, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও ইত্যাদি গোষ্ঠীর বিদ্রোহী নায়করা কখনই সমস্ত গোষ্ঠীগুলিকে একত্রিত করে আন্দোলনে সামিল করতে পারেননি।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জয়পাল সিং এর নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন যদিও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল তবু তাতে সামগ্রিক অংশগ্রহণ ছিল না এবং গণচেতনার পরিবর্তে অন্ধ আবেগই ছিল মুখ্য। জয়পাল সিং-এর সস্ত্রীক কংগ্রেসে যোগদানের ফলে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। ঝাড়খণ্ড পার্টির সভাপতি এন. ই. হোরো কোনক্রমে টিম টিম করে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হন। বাগুন সোমরাই-এর মত করে ঝাড়খণ্ড সমর্থকরাও হতোদ্যম হয়ে জাতীয় কংগ্রেস বা অন্যদলে যোগদান করেন।

এর পরই চরম বামপন্থী একটি গোষ্ঠী এবং ঝাড়খণ্ড এলাকার একটি তরুণ বুদ্ধিজীবি গোষ্ঠী ঝাড়খণ্ডী আন্দোলন সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। শুরু হয় ঝাড়খণ্ডী জনপদ, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা। তারই

ফলশ্রুতি হিসেবে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় আদিবাসী এবং ক্ষেত্রিয় ভাষা বিভাগ। ঝাড়খণ্ডী জাতিগোষ্ঠীগুলিকে ঝাড়খণ্ডী জাতীয়তায় একসূত্রে গ্রথিত করার ঐতিহাসিক অধ্যায়ের ফলশ্রুতি হিসাবে ঝাড়খণ্ড পার্টি এবং ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সংবিধানে নতুন করে তৈরী হয় ঝাড়খণ্ডী আদিবাসীদের তালিকা। যাতে, সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, হো, খাড়িয়া, বীরহোড়, কোল, মাল, মাহালী ইত্যাদি তালিকাভুক্ত আদিবাসী বাদেও ১৯৩১ সাল পর্যন্ত আদিবাসী তালিকাভুক্ত কুড়মি (মাহাত), কুমহার, কুইরী, জোলা, তাঁতি, হাড়ি, ডোম, মুচি, বাউরী, রাজোয়াড়, খাটোয়াল, বাগাল, বেদিয়া, কামার, লোহার ইত্যাদি কৃষিজীবি, বৃত্তিজীবি ও হরিজন সম্প্রদায়গুলিকে ঝাড়খণ্ডের আদিম অধিবাসী বলে স্বীকার করা হয়।

এ পর্যন্ত সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও ইত্যাদি আদিবাসীরা ঝাড়খণ্ড এলাকায় তাঁদের গোষ্ঠীগত রাজ্য গঠনের স্বপ্নে বিভোর ছিল এবং আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও ঐক্যের বদলে সংঘাতই ঘটত বেশী। কিন্তু নতুনভাবে ঝাড়খণ্ডী আদিবাসীত্বের দীর্ঘকালীন প্রচারে ধীরে ধীরে সমস্ত জাতিগোষ্ঠীগুলিই ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগল। তালিকাভুক্ত আদিবাসী ও তালিকা বহির্ভূত আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মাহাত (কুড়মি) জনগোষ্ঠী ঝাড়খণ্ড এলাকায় এক বৃহত্তর এবং প্রভাবশালী গোষ্ঠী। এযাবৎ আন্দোলনগুলিতে চুয়াড় বিদ্রোহে দামোদর দিগার, বুলি মাহাত, রঘুনাথ মাহাত, চানকু মাহাত, গোপাল মাঝি বাদে মাহাতদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। জয়পাল সিং এর আন্দোলনে গিরীশ মহান্ত, পার্বতি মাহাত ইত্যাদি অনেকেই অংশগ্রহণ করলেও তার প্রভাব কুড়মি সমাজে খুব একটা গভীরতা লাভ করেনি।

সত্তরের দশকে ধানবাদের বুকে, বিনোদ বিহারী মাহাতর নেতৃত্বে শিবাজী সমাজ, শিবু সোরেনের সনৎ সান্তাল সমাজ এবং এম.সি.সি. র এ. কে. রায়ের মিলিত প্রচেষ্টায় গঠিত হয় ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা। তখন থেকেই মাহাতদের একটা বিরাট অংশ বিনোদ বিহারী মাহাতর নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে সামিল হয়। পরবর্তীকালে বিনোদ বিহারী মাহাতকে ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চার সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে তরুণ নেতা নির্মল মাহাতকে সভাপতি করা হয়। বিনোদ মাহাত, শিবু সোরেন এর ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা চরমপন্থী গোষ্ঠী হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও, বিনোদ মাহাতর অপসারণের ফলে সমর্থকদের মনোবল ভেঙে যায় এবং আন্দোলন প্রায় স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তরুণ নেতা নির্মল মাহাতর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সংগ্রামী নেতৃত্বের ফলে গোটা সিংভূম এলাকায় ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা আধিপত্য স্থাপন করে। ক্রমে নির্মল মাহাত শুধুমাত্র মাহাত গোষ্ঠী নয় সমস্ত ঝাড়খণ্ডী আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। নির্মল মাহাত যে সময়টায় আদিবাসীদের আশা আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে উঠছিলেন সেই সময়েই তাকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হোল এবং হত্যাকারীরা কংগ্রেসের লোক হিসেবে চিহ্নিত হোল।

নির্মল মাহাতর হত্যায় হতাশার বদলে আদিবাসীদের মনে দেখা দিল প্রচণ্ড ক্ষোভ।

তাছাড়া শিবু সোরেন কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত গড়ায়, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার যে কংগ্রেস ঘেঁষা রাজনীতির ইমেজ তৈরী হয়েছিল তা কংগ্রেসের লোকের দ্বারা নির্মল মাহাত হত্যাকাণ্ডে পুরোপরি বিনষ্ট হোল। নির্মল মহাত হত্যাকাণ্ডে, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা বনধ না ডাকলেও জামশেদপুর তিনদিন পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায়। ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, পুরুষ দলমত জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় হাজার হাজার মানুষকে। শোক মিছিলে অংশ নেয় লক্ষাধিক মানুষ। শ্রাদ্ধানঠানের দিন টিস্কোতে শ্রমিকরা কাজে যোগ দেননি। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রীষ্টান নিজ নিজ প্রথানুযায়ী শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন। রাঁচী, ধানবাদ, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ইত্যাদি গোটা এলাকায় কোন না কোন দিন বনধ পালিত হয়। ঝাড়খণ্ডীদের আক্রোশে সিংভূম এলাকায় বেশ কিছু ব্যক্তি খুন হয়। ২২শে অক্টোবর জনসভায় জামশেদপুরের রিগ্যাল ময়দানে জমায়েত হয় প্রায় চার লক্ষাধিক মানুষ। নির্মল মাহাতর জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য হিসেবে এগুলির উল্লেখ করা যায়।

এর আগে ধানবাদে শক্তি মাহাত, সুরেশ মাহাত, সিংভূমে অজিত মাহাত, ধনঞ্জয় মাহাত, পুরুলিয়ায় বৃহস্পতি মাহাত, আনন্দ মাহাত, রোহিনী মাহাত, লক্ষণ মাহাত, ফুলেশ্বর মাহাত ইত্যাদি অনেক মাহাত ছেলেই ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে শহীদ হয়েছে। কিন্তু নির্মল মাহাতর মৃত্যু মাহাত সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশকে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল করে দেয়। এক কথায় মাহাতরাও গোষ্ঠীগত ভাবে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে সামিল হয়ে পড়ল। এর পরই ঘটনার স্রোত দ্রুতলয়ে মোড় নেয়। ঝাড়খণ্ড ছাত্র সংগঠন আজসু ঝাড়খণ্ড পার্টি, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, ঝাড়খণ্ড মহাসভা, ঝাড়খণ্ড ক্রান্তিদল, ঝাড়খণ্ড সংঘর্ষ সমিতি, সি. পি. আই (এম. এল) ইত্যাদি ৪৯টি ছোটবড় সংগঠন নিয়ে গঠিত হয় ঝাড়খণ্ড কো-অর্ডিনেশন কমিটি। এর আগেও ঝাড়খণ্ড সংগঠনগুলিকে এক মঞ্চে আনার চেষ্টা হয়েছে বিস্তর কিন্তু কার্যতঃ ফলপ্রসু হয়নি, সেই প্রচেষ্টা কিন্তু নির্মল মাহাতর মত্যু যেন এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে প্রত্যক্ষভাবেই। তাছাড়া কংগ্রেস কর্মীদ্বারা নির্মল মাহাতর হত্যায় কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি যথা বি. জে. পি., জনতা, লোকদল, সি. পি. আই. জনমোর্চা ইত্যাদি ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকে প্রকাশ্যে সমর্থন করার সুযোগ পেয়ে যায়।

এই অবস্থাকে কাজে লাগানোর জন্য ঝাড়খণ্ড সমন্বয় কমিটি বীরসা মুণ্ডার জন্মদিন ১৫ই নভেম্বর রাঁচীতে জনসমাবেশের ডাক দেয়। ঝাড়খণ্ডীদের মিলিত শক্তি ছাড়াও কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থকদের নিয়ে রাঁচীতে উল্লেখযোগ্য জমায়েতকে বানচাল করতে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরিবহন ব্যবস্থাকে প্রায় অকেজো করে দেয়। রাঁচী যাওয়ার সমস্ত রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেওয়া হয়। ট্রেন চলাচলও বন্ধ করা হয়। রাঁচী শহরে সবকটি রাস্তা পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। ১৫ই নভেম্বরের আগের দিনেই পৌছে যাওয়া কয়েক হাজার জনতাকে নিয়ে ঝাড়খণ্ড সমন্বয় কমিটি সভা করেন

এবং পুলিশী তৎপরতার ক্ষোভকে কাজে লাগানোর জন্য সমন্বয় কমিটি ঝাড়খণ্ড বনধের ডাক দেয়। ঝাড়খণ্ড বনধ প্রায় সফলই বলতে পারা যায়। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে ঝাড়খণ্ডীরা।

চুয়াড়, কোল, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, কুড়মি ইত্যাদি বিদ্রোহের উত্তরাধিকারীরা মোটামুটিভাবে একসূত্রে গ্রথিত, কুড়মি (মাহাত), কামার, বাগাল, বীরহোড়, হো, কুমহার, কুইরী, মোমিন, তাঁতি, মাল, মাহালি, ডোম, ঘাসি, রাজোয়াড়, ঘাটোয়াল, বাউরী, বাগদী সকলেই প্রায় ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে সামিল। স্থানীয় বাঙালী, বিহারী, ওড়িয়াকে ঝাড়খণ্ডীরা আন্দোলনে অংশ নিতে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের একাধিপত্যে এতদিন সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিধু কানুর উত্তরাধিকারী দিশম গুরু শিবু সোরেন ছিলেন প্রতিষ্ঠিত। এখন বুলি মাহাত, রঘুনাথ মাহাত, চানকু মাহাত নির্মল মাহাতর উত্তরাধিকারী শৈলেন্দ্র মাহাত, বিনোদ বিহারী মাহাতরা এগিয়ে যেতে চাইছেন ছাত্রনেতা, সূর্য সিং বেসরা, এন. ই. হোরো প্রভাকর টিরকি, ডঃ বি. পি. কেশরী, সন্তোষ রাণা সকলেই উঠে আসতে চাইছেন পুরোভাগে। তাছাড়া বীরসা মুণ্ডার উত্তরাধিকারী রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডাঃ রামদয়াল মুন্ডা, ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের জন্য নাকি উপাচার্য্যের পদে ইস্তফা দিতেও প্রস্তুত সুতরাং ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের বৃহত্তম সংগঠন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার লড়াকু নেতা শিবু সোরেনেরও তার কংগ্রেস ঘেঁষা রাজনীতিতে মিইয়ে থাকার জো নেই। একদিকে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকারীদের মধ্যে বৃহত্তম সংগঠন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার চরিত্র বদল অন্যদিকে গোষ্ঠীচেতনা থেকে সমর্থকদের বৃহত্তর ঝাড়খণ্ডী জাতীয় চেতনায় উন্নীত করা তথা মাহাতদের মত এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে আন্দোলনে সামিল করা এবং ঝিমিয়ে পড়া ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে তীব্র গতিসঞ্চার করার মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি নির্মল মাহাতর উত্থান ও পতনের ফলে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং নির্মল মাহাতর মৃত্যু ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের ইতিহাসে সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

কোন বিশেষ জাতি গোষ্ঠীর নয়, নির্মল মাহাত শোষিত, নিপীড়িত, পতিত নির্যাতিত ঝাড়খণ্ডী জনতার মুক্তি দূত হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অমর হয়ে থাকবে তার বিখ্যাত উক্তি, "জুলম্, তো জুলম্ হ্যায় বঢ়তা হ্যায় তো মিট জাতা হ্যায়, খুন তো খুন হ্যায় টপকতা হ্যায় তো জম জাতা হ্যায়।"

লেখক পরিচিতি



পোষাকি নাম, সুনীল কুমার মাহাত, লিখেন সুনীল মাহাত নামে এবং এই নামেই সবাই চেনেন। বাবা ঁকালিপদ মাহাত ও মা ঁসুভদ্রা মাহাত দুজনেই গত হয়েছেন। একমাত্র ভাই ঁসত্যরঞ্জন গত হয়েছেন। দুই বোন হিমানী ও মমতা সুখে শান্তিতে ছেলেপুলেদের নিয়ে সংসার ধর্ম পালন করছেন। পুরুলিয়া জেলার পাড়া ব্লকের কালুহার গ্রামে সুনীলের জন্ম, ২৯ নভেম্বর ১৯৫৪। এখানেই তার ১০ পুরুষের বসতি এবং এখনো তার ভিটেবাড়ি জমিজমা সেখানেই রয়েছে। প্রায় চার দশক রয়েছেন হুচুকপাড়া, পুরুলিয়া শহরে। স্ত্রী চন্দ্রা মাহাত, তিন কন্যা-সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, আশ্চর্য্য ও পুত্র- কলম্বাস, দুই জামাই- প্রদীপ ও বসন্ত, দুই নাতনি-রাহি,বিহু ও ছোট্ট নাতিকে নিয়ে দীর্ঘদিন আছেন এখানেই। মাঝে মধ্যে কাজে কম্মে গ্রামের বাড়িতে যান। মালথোড় ও নডিহা - স্কুলে পড়াশোনা। জে.কে. কলেজ পুরুলিয়া থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক। কোলকাতার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ল কলেজ থেকে এল এল বি এবং রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইবাল এন্ড রিজিওনাল ল্যাঙ্গুজেস ডিপার্টমেন্ট থেকে কুড়মালি ভাষায় এম এ পাস করেছেন ৮০ র দশকে। চাকুরী, ওকালতি, অধ্যাপনা কিছুই করা হয়নি। সি.সি.সি.এ, সোল, পুরুলিয়া জনবিকাশ মঞ্চ, বাঙলা নাটক ডট কম ইত্যাদি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এর সঙ্গে দীর্ঘদিন জনসেবামূলক কাজ করেছেন। সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত, সন্দেশ পত্রিকায় ছোটদের জন্য গল্প লেখা দিয়ে লেখার জগতে হাতেখড়ি। এরপর তেপান্তর, শিশুতীর্থ, বর্তমান দিনকাল, পরিবর্তন, পল্লীগ্রাম, শিলালিপি ইত্যাদি অনেক পত্র পত্রিকায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ লিখেছেন। অতিথি, সারহুল, পুরুলিয়া এক্সপ্রেস, আনার বানার, করমতীর্থ ইত্যাদি পত্রপত্রিকা সম্পাদনা করেছেন দীর্ঘদিন। কুড়মালি মানভূমি ও বাঙলা ভাষায়, গল্প , কবিতা, উপন্যাস, নাটক, কাব্য, মহাকাব্য, জীবনী গ্রন্থ, আত্মজীবনী লিখেছেন। রামায়ণ, মহাভারত ও বেশকিছু রবীন্দ্রসংগীতের কুড়মালি অনুবাদ করেছেন। তার রচিত বহু ঝুমুরগান পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে, বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুড়মি উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পর্ষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন এবং পুরুলিয়া সিধু কানু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ঝাড়গ্রামের সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের কুড়মালি বিভাগে কুড়মালি ভাষা বিকাশ তথা পঠনপাঠনের সঙ্গে জড়িত আছেন।

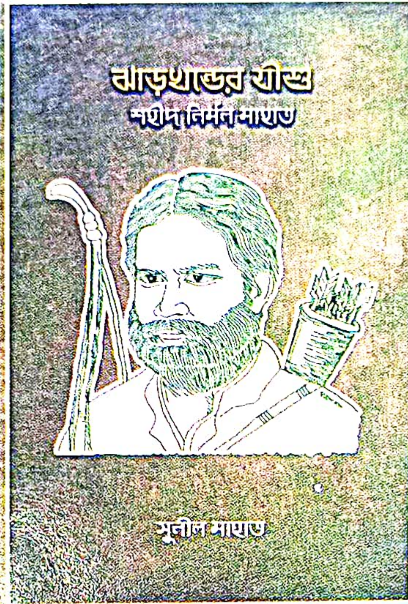
২০১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, পুরস্কার দিয়েছেন, ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগ এর সবলা মেলায়, পুরুলিয়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলাশাসক মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করেন, শহীদ নির্মল মাহাত তার জীবৎকালে জামশেদপুরে, ঝাড়খণ্ডশ্রী উপাধি ভূষিত করেন। এছাড়া বহু সংগঠনের পক্ষ থেকে অগনিত পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছেন। //

Nirmal's, massage to people

Last Saturday an assassin's bullet silenced the voice of Nirmal Mahato, which was in essence the voice of the poor, the downtrodden, the inarticulate victims of exploitation. But has the voice been silenced ? I don't think, so. I sincerly believe that if Nirmal Mahato alive was a symbol of hope to thousands, Nirmal Mahato dead is an oath to tens of thousands symbolising a relentless fight against the forces of exploitation. The "morcha" for the "mukti" of Jharkhand is now more powerful when the president of the Jharkhand Mukti Morcha is slain I'm convinced that Nirmal dead is more powerfull than Nirmal alive, young Nirmal had the limitations of flesh, being able to visit only one place at a tirne. But Nirrnal dead has been able reach out to the entire tribal heartland of Chhotanagpur with a simple message. "We must travel hopefully, we'll certainly arrive."

I am convinced because I have seen thousands of his followers who came from all over Chhotnagpur to pay homage to their leader last Monday, I have seen the controlled grief of them. I have seen the fury held in reins by an innate sense of discipline. The fears off the administration were found baseless. There was no untoward incident at Jamshedpur, Thousands grieved for their leader but they never for a moment forgot the lessons tought by Nirmal Mahato "Come what may, we will travel hopefully and someday we will arrive." Nothing could have been a more fitting homage to Nirmal than this.

ASHIT BISWAS
15th August 1987
Amrit Bazar Patrika



প্রচ্ছদ : স্বরূপ দত্ত